পাহাড়ী ললনা

কাসেম বিন আবুবাকার

BELAL

EXCLUSIVE

BANGLAPDF

Please, Give us Some Credit When U Share Our Books

Visit Us At BANGLAPDF.NET

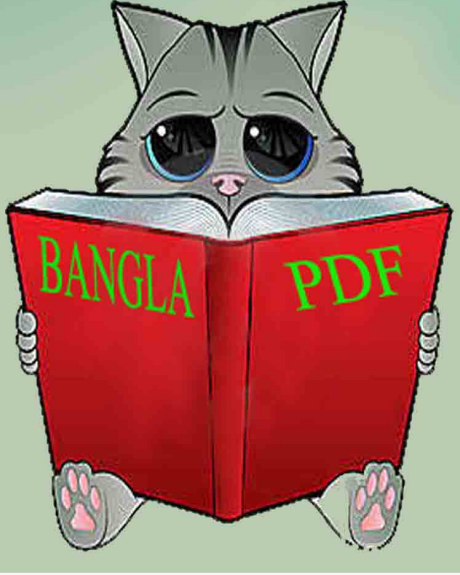

Scanning & Editing

BELAL AHMED

পাহাড়ী ললনা

(অমর প্রেম কাহিনী)

কাসেম বিন আবুবাকার

সাহিত্যমালা ঃ ঢাকা

প্রকাশক ঃ
সাহিত্যমালা
৩৪/২ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা—১১০০

প্রকাশকাল ঃ

প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর	১৯৯২
দ্বিতীয় প্রকাশ	ঃ জুন	১৯৯৪
তৃতীয় প্রকাশ	ঃ জুন	১৯৯৫
চতুর্থ প্রকাশ	ঃ ডিসেম্বর	১৯৯৬
পঞ্চম প্রকাশ	ঃ জুন	১৯৯৭
ষষ্ঠ প্রকাশ	ডিসেম্বর	১৯৯৯

স্বত্ব ঃ
[প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ
সরদার জয়নুল আবেদীন

কম্পোজ ঃ
অরণি কম্পিউটার্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, (৩য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা—১১০০
দূরভাষ ঃ ২৩৯৪২৩

মুদ্রণে ঃ
ইউনিভার্সেল প্রেস
৩০, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা—১১০০

দাম ঃ
সাদা কাগজে— ৭০.০০ টাকা
নিউজ কাগজে— ৫০.০০ টাকা

ভূমিকা

আল্লাহ্ পাকের অপার করুণায় এই উপন্যাসখানা শেষ করতে পেরে তাঁর পাক দরবারে শতশত শুক্রিয়া আদায় করছি। এর নায়িকা সিলেটের উত্তরাঞ্চলের এক পাহাড়ী ললনা। ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নায়িকার জন্ম হলেও ভাগ্যের স্বীকার হয়ে সে এক পাহাড়ী সর্দারের মেয়ে হিসাবে লালিত-পালিত হয়। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সে তার আসল পরিচয় জানতে পারে নি। নায়ক ঢাকার এক ধর্মপরায়ণ বীজনেস ম্যাগনেটের ছেলে। কোন কারণে সে ঐ এলাকার পোস্ট মাস্টারীর চাকরি নিয়ে সেখানে যায়। সে নিজে একজন আর্টিস্ট। পাহাড়ে ছবি আঁকতে গিয়ে নায়িকার সঙ্গে তার পরিচয়। তারপর ভাগ্য তাদেরকে নিয়ে যে খেলা খেলল, সেই ঘটনা নিয়েই এ কাহিনী।

সেই পাহাড়ী এলাকায় অধিবাসীদের ভাষা বোধগম্য নয় বলে আমি তাদের কথোপকথন নিজের কাল্পনিক ভাষায় লিখেছি। পাঠকবর্গের কাছে সে জন্যে ক্ষমা প্রার্থি।

আশা করি এই উপন্যাসখানা পড়ে পাঠক পাঠিকারা একটু নতুন চমক পাবেন। আর সেই সঙ্গে কিছু জ্ঞানের উপাদান পেয়ে সেগুলো অনুশীলন করার প্রেরণা অনুভব করবেন।

ওয়াস সালাম

ইতি—

১৭/৭/৯২ ইং

লেখক

পাহাড়ী ললনা

কাসেম বিন আবুবাকার

আমাদের প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

১। ফুটন্ত গোলাপ
২। বিদেশী মেম
৩। ক্রন্দসী প্রিয়া
৪। প্রেমের পরশ
৫। বিলম্বিত বাসর
৬। প্রেম বেহেস্তের ফল
৭। একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল
৮ পাহাড়ী ললনা
৯। শরীফা
১০। শ্রেয়সী
১১। বিদায় বেলায়

প্রথম

ধরা পড়ে মেয়েটা একবার পিছনে ফিরে চেয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

কায়সারও তার পিছনে ছুটতে ছুটতে বলল, পালাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান। কিন্তু মেয়েটা দাঁড়াল না। ছুটতে ছুটতে গাছপালার আড়াল হয়ে গেল। কায়সার তাকে ধরার জন্য ছুটছিল, একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের নিচের দিকে নেমে চলল। পড়ে যাবার সময় শুধু তার মুখ দিয়ে ইয়া আল্লাহ শব্দ বেরিয়েছিল। তারপর গড়াতে গড়াতে জ্ঞান হারিয়ে পাহাড়ের নিচে এসে পড়ল।

মেয়েটা কায়সারের পড়ে যাবার ও তার ইয়া আল্লাহ বলার শব্দ শুনতে পেয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাতে তাকে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড় থেকে পড়ে যেতে দেখে ভয়ে সেও ইয়া আল্লাহ একি হল বলে ধরার জন্য ছুটে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।

পাহাড়ের এদিকটা ছোট ছোট জঙ্গলী ঘাসে ভরা। দূরে দূরে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। মেয়েটাও কয়েকবার পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছে। তবু ঢাল বেয়ে ছুটছে। কিন্তু সে তার কাছে পৌঁছাবার আগে পাহাড়ের নিচে পড়ে কায়সারের অজ্ঞান দেহটা নিশ্চল হয়ে গেছে। মেয়েটা এসে তার রক্তাক্ত শরীর দেখে আঁৎকে উঠল। ভাবল মারা গেল নাকি? নাকে হাত দিয়ে বুঝতে পারল বেঁচে আছে। তাড়াতাড়ি অল্প দূরে নদী থেকে আঁজলা ভরে পানি এনে কয়েকবার তার চোখে-মুখে ঝাপটা দিল। তাতে কাজ না হওয়ায় তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নদীর কিনারে এনে শুইয়ে দিয়ে নিজের ওড়না ভিজিয়ে মাথায় পানি দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পানি দিয়েও যখন জ্ঞান ফিরল না তখন মেয়েটা আবার তাকে পাঁজাকোলা করে পাহাড়ের কাছে এনে একটা সমতল জায়গায় শুইয়ে দিয়ে নিজের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল।

মেয়েটার নাম সাবিহা। এই জৈন্তাপুর পাহাড়ী এলাকার সর্দারের মেয়ে। সিলেট শহরে মেয়েদের হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। তার বাবার নাম দেলওয়ার সর্দার। খুব নাম করা লোক। পাহাড়ী সর্দার হলেও তিনি সভ্য সমাজের মত জীবন-যাপন করেন। পাহাড়ের উপর একতলা কয়েক কামরা পাকা বাড়ী। নিজস্ব দুটো ট্রাক ও একটা প্রাইভেট কার আছে। প্রচুর টাকা খরচ করে বাড়ীতে ইলেক্ট্রিক লাইন এনেছেন। সরকারের কাছ থেকে অনেক পাহাড় ও জমি-জায়গা লিজ নিয়ে নানারকম ফসল চাষাবাদ করেন। উনার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটা বড়। নাম আদিল। দেলওয়ার সর্দার আদিলকে বি.এ.পর্যন্ত পড়িয়ে ব্যবসায় নামিয়েছেন। নিজে প্রচুর চাষাবাদ করেন। যত সব ফসল এবং এই এলাকায় যত রকমের ফসল উৎপন্ন হয়, আদিল সে সব কিনে দেশ বিভিন্ন শহরে, বন্দরে সাপ্লাই দেয়। বছর তিনেক হল লুবাবা নামে এক পাহাড়ী

এস.এস.সি. পাস মেয়েকে বিয়ে করেছে। লুবাবার বাবা পাহাড়ী হলেও সিলেট টাউনে নানারকম ফলের পাইকারী ব্যবসা করে। এই ব্যবসা করে সেখানে একটা বাড়ীও করেছে। সেখানে স্বপরিবারে থাকে।

সাবিহা এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে এসেছে। ছোট বেলা থেকে পাহাড়ী মেয়েদের সাথে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, খেলাধূলা করেছে। তাই বড় হয়ে শহরে থেকে কলেজে পড়লেও ছোটবেলার অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। যখন গ্রামে আসে তখন ঘাগরা ও কামিজ পরে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন দিন একা একা ঘুরে বেড়ায়। পাহাড়ী যুবকেরা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। সাবিহাকে তারা নিজেদের কওমের বলে বিশ্বাস করতে পারে না। অনেকে তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল কিন্তু তারা জানে ধনী সর্দারের মেয়েকে বিয়ে করা একেবারে অসম্ভব। তাই তারা মনের আশা মনে চেপে রেখে হা-হুতাশ করে। কোন ছেলের বা তাদের মা-বাপের ঘাড়ে রক্ত নেই, সর্দারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিবে। সম্প্রতি আদিল ব্যবসার জন্য হাবিব নামে একজন শিক্ষিত যুবককে ম্যানেজার করে এনেছে। সেও সাবিহার রূপে মুগ্ধ। তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে আছে।

হাবিব শ্রীমঙ্গলের আজরাফ পাইকারী ব্যবসায়ীর ছেলে। বি.এ. পাস করে বাপের সঙ্গে ব্যবসা করত। আজরাফ আদিলের মোটা খদ্দের। ব্যবসায়িক লেনদেন খুব ভাল। আজরাফ খুব বুদ্ধিমান লোক। তাই আদিলের কাছে যখন শুনল, তার একজন বিশ্বাসী ও শিক্ষিত ম্যানেজার দরকার তখন নিজের ছেলেকে পাকা ব্যবসায়ী করার জন্য হাবিবের কথা তাকে বলল।

আদিল খুশী হয়ে বলল, হাবিবকে আমি চিনি। তাছাড়া আপনার ছেলে যখন তখন তো আর কোন কথা নেই। মাত্র মাস ছয়েক হল হাবিব আদিলের ম্যানেজার হয়ে কাজ করছে। সে দেশের বিভিন্ন শহরে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে মালের অর্ডার নিয়ে আদিলের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আবার অনেক সময় দুজন দুটো ট্রাকে করে নিয়ে গিয়ে ঐসব জায়গায় পাইকারী বিক্রী করে। টাকা-পয়সার লেনদেন হাবিবকে করতে হয়। কাজে জয়েন করার মাস দুই পরে সাবিহাকে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। পাহাড়ী মেয়ে যে এত সুন্দরী হতে পারে, তা সে ভাবতেও পারে নি।

বেলা বেশী নেই দেখে সাবিহা প্রাণপণ ছুটছে। পাহাড়ী মেয়ে পাহাড়ী চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে ছুটাছুটি করা তার অভ্যেস আছে। স্বাস্থ্যও খুব ভাল। অবস্থাপন্ন সর্দারের মেয়ে। ভাল-মন্দ প্রচুর খায়। শরীরে শক্তিও প্রচুর। তাই তখন কায়সারকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতে কোন কষ্ট হয় নি। আর এখন পাহাড়ী পথ বেয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠলেও ক্লান্তি বোধ করছে না। সে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে। তার মাথায় তখন দুটো চিন্তা। এক, তার জন্যেই বাবুজীর এই দশা। দুই, রাত হয়ে গেলে বন্য জন্তুতে তাকে

খেয়ে ফেলতে পারে। তাদের গ্রামটা বেশ একটু দূরে। তাই যখন সে বাড়ীর কাছাকাছি এল তখন বেলা প্রায় ডুবু ডুবু।

দেলওয়ার সর্দার একটা পাহাড়ে কামলাদের নিয়ে আনারস গাছ লাগাচ্ছিলেন মেয়েকে ছুটে আসতে দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বেটি, তুই ঐ দিক থেকে ছুটে আসছিস কেন?

সাবিহা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এক বাবু পাহাড় থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চল, রাত হয়ে গেলে জন্তু-জানুয়ার খেয়ে ফেলবে।

ঃ কোন পাহাড় থেকে?

ঃ ঝর্নার দিকে এক পাহাড় থেকে।

ঃ সে তো বেশ দূরে, তুই দেখলি কি করে?

ঃ আমি আজ ঝর্না দেখতে গিয়েছিলাম।

দেলওয়ার সর্দার একটু রাগের সঙ্গে বললেন, তোকে একা ঐদিকে যেতে নিষেধ করেছি না?

ঃ আর যাব না বাবা তুমি তাড়াতাড়ি চল।

পাহাড়ীরা বিপদগ্রস্তকে প্রাণ দিয়ে হলেও সাহায্য করে। দেলওয়ার সর্দার কামলাদের বললেন, তোমরা আমাদের সঙ্গে এস; ে নাকি পাহাড় থেকে পড়ে গেছে।

তারা যখন সেখানে এসে পৌছাল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেলওয়ার সর্দার কায়সারকে দেখে বললেন, ইয়ে তো সালুটিকুরের কা পোস্ট মাস্টার, তারপর সঙ্গীদের বললেন, জলদী ইনকো লে যানেকা এন্তজাম করো।

সকলে মিলে রক্তাক্ত জ্ঞানহীন কায়সারকে নিয়ে যখন গ্রামে ফিরে এল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বৈঠকখানার বিছানায় কায়সারকে শুইয়ে দিয়ে দেলওয়ার সর্দার একজন লোককে বৈদ্যকে ডেকে আনতে পাঠালেন।

বৈদ্য এসে দেখে বলল, বাবু আল্লাহ কা করম সে বাঁচ গায়া। সারা বদন মে চোট লাগা, লেকিন কোই জাগা টুটা নেহী। আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো গরম পানিতে নরম কাপড় ভিজিয়ে রক্ত পরিষ্কার করে এক রকম মলম লাগিয়ে দিল। তারপর কাপড়ের থলে থেকে দু-তিন রকমের গাছের শিকড় বের করে বেটে আনতে বলল। সাবিহা তা করে নিয়ে এলে বৈদ্য চামচ দিয়ে দাঁত ফাঁক করে তার মুখের মধ্যে দিয়ে মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পানি ঢালার পর কায়সারকে চোখ খুলতে দেখে বৈদ্য বলল, আব কো-ই-ডর নেহী। লেকিন দাওয়াই কা বারে মে আওর কুছ দের তক বেহুঁশ রাহে গা। উসকা বাদ পুরা হুঁশ মে আজায়ে গা।

কায়সার জ্ঞান ফিরে পাবার পর সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভব করল। কোন কথা

বলতে পারল না। শুধু একবার চারদিকে তাকিয়ে পরিবেশটা উপলব্ধি করে চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করল। কিন্তু চোখের পানি রোধ করতে পারল না। চোখের পানি গাল বেয়ে বালিশে পড়তে লাগল।

কায়সারের অবস্থা দেখে সাবিহারও চোখে পানি এসে গেল। সে এতক্ষণ নিজেকে দোষী ভেবে অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছিল, আর মনে মনে আল্লাহকে জানাচ্ছিল আল্লাহ তুমি এই বাবুজীকে ভাল করে দিয়ে আমাকে শাস্তি দাও। বাবুজির জ্ঞান ফিরতে দেখে কিছু স্বস্তি পেলেও যন্ত্রণার জন্যে যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, সে কথা ভেবে সে নিজেও খুব কষ্ট অনুভব করতে লাগল।

দেলওয়ার সর্দার এবার সব লোকজনদের চলে যেতে বললেন। তারা চলে যাবার পর মেয়েকে বললেন, তুই বাবুর কাছে বস, আমি এশার নামায পড়ে আসি।

আদিলের স্ত্রী লুবাবা এতক্ষণ ননদের দিকে লক্ষ্য করছিল। তার হাবভাব ও চোখের পানি দেখে বুঝতে পারল, বাবুজীর পাহাড় থেকে পড়ে যাবার ব্যাপারে সাবিহাও হয়তো জড়িত। তার এইরূপ চিন্তা করার কারণ ছিল। সাবিহা প্রথম যেদিন কায়সারের বিস্কুট চুরি করে এনে ভাবীকে সঙ্গে নিয়ে খেতে খেতে ঘটনাটা হাসতে হাসতে বলেছিল এবং তারপরের দিনগুলোতে যা ঘটেছিল তাও বলেছিল। তখন লুবাবা যেন কিছু অনুমান করেছিল। এখন তার অবস্থা দেখে নিজের অনুমান পরীক্ষা করার জন্যে শ্বশুর চলে যাবার পর সাবিহাকে বলল, তুমি থাক, আমি একটু আসছি। লুবাবা সেখান থেকে বাইরে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের দিকে লক্ষ্য রাখল।

কায়সারের জ্ঞান ফেরার পর বৈদ্য সকালে আবার আসবে বলে আগেই চলে গেছে। ভাবী চলে যাবার পর সাবিহা খাটে কায়সারের এক পাশে বসে তার মুখের দিকে চেয়ে চোখের পানি ফেলতে লাগল।

পরীক্ষা শেষে বাড়ীতে এসে সাবিহা প্রথম কয়েক দিন সাথিদের নিয়ে কাছাকাছি পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদেরকে একদিন বলল, আজ ঝর্না দেখতে যাই চল। যে পাহাড় থেকে ঝর্নাটা দেখা যায়, সেটা ওদের গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূর। তাই তারা যেতে রাজী হল না। সাবিহা অনেক দিন হল ঝর্না দেখে নি। তার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগে। ঝর্না দেখার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সঙ্গের মেয়েরা যেতে রাজী না হওয়ায় সে একা ঝর্না দেখতে এসেছিল। যে পাহাড় থেকে ঝর্না দেখা যায়, সেই পাহাড়ের মাথায় উঠে শহরের এক বাবুকে ছবি আঁকতে দেখতে পায়। বাবুর সুন্দর চেহারা দেখে তার মনে এক রকমের আনন্দের স্রোত বইতে শুরু করে। কাছাকাছি এসে একটা মোটা সেগুন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে ভাবল, এত দূরের পাহাড়ে এসে এই বাবু ছবি আঁকছে। ভয়-ডর বলতে কি তার নেই? হঠাৎ বাবুর জিনিস-পত্রের দিকে লক্ষ্য পড়তে দুষ্টুমি করার ইচ্ছা জাগল। সে পা টিপে

টিপে বিস্কুটের ঠোঙ্গাটা নিয়ে সেদিন পালিয়ে আসে। তারপর কয়েকদিন সাবিহার শরীর খারাপ থাকায় আসতে পারে নি। তবে রবিউলকে কয়েকটা টাকা বখশীষ দিয়ে রোজ একবার করে ঐ পাহাড়ে গিয়ে কোন বাবু ছবি আঁকতে আসে কিনা জানতে পাঠিয়েছে। রবিউল প্রতিদিন গিয়ে ফিরে এসে বলেছে, সে ঐ পাহাড়ে কাউকে দেখে নি।

রবিউলের বাবা দেলওয়ার সর্দারের ক্ষেতে খামারে বারমাস কাজ করত। সে যখন মারা যায়, তখন রবিউল বেশ ছোট ছিল। রবিউলের অন্যান্য ভাই-বোনেরা বড় হয়ে বিয়ে করে আলাদা থাকে। ছেলেরা ভাত-কাপড়ের কষ্ট দেয়। স্বামী মারা যাবার পর রবিউলের মায়ের একবার খুব কঠিন অসুখ হয়। ভাল হবার পর কোন ভারী কাজ কর্ম করতে পারে না। দেলওয়ার সর্দার তার কষ্টের কথা জানতে পেরে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে। বুড়ী টুক টাক যা পারে বাড়ীর কাম-কাজ করে আর সর্দারের বাড়ীর পাশে একটা ঝুপড়িতে ছোট ছেলে রবিউলকে নিয়ে থাকে। রবিউলও মায়ের কাজে সাহায্য করে। রবিউলের বয়স এখন তের-চৌদ্দ বছর। সে সাবিহার খুব বাধ্য। তাকে বুয়া বলে ডাকে। সপ্তাহ খানেক পরে শুক্রবার দিন বলল, জান বুয়া, আজ এক খুবসুরৎ বাবুকে ঐ পাহাড়ে তসবির আঁকতে দেখলাম। সাবিহা রবিউলকে কিছু কিছু বাংলা লিখতে পড়তে এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে শিখিয়েছে।

তার কথা শুনে সাবিহা বলল, তুই খোঁজ রাখবি, কোন্ কোন্ দিন ঐ বাবু তসবির আঁকতে আসে। তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সারে নি।

রবিউল এ সপ্তাহে প্রতিদিন গিয়ে বাবুকে দেখল না। শুক্রবার দিন আবার দেখতে পেল। ফিরে এসে সাবিহাকে বলল, হামার কি মনে হয় জান বুয়া, বাবু হর শুক্রবার ছবি আঁকতে আসে।

সাবিহা বলল, ঠিক আছে, তোকে আর সেখানে যেতে হবে না। পরের শুক্রবারে সাবিহা একা এসে অনেকক্ষণ বাবুকে দেখল। তারপর বিস্কুটের প্যাকেট নেবার সময় পাশে একটা ঝর্নার আঁকা ছবি দেখতে পেয়ে সেটাও নিয়ে পালিয়ে আসে। পরের শুক্রবার আজ গিয়ে এই ঘটনা ঘটল। ভাবল, বাবুজীর ডাকে যদি আমি দাঁড়াতাম, তাহলে বাবুজী এরকম দুর্ঘটনায় পড়ত না।

সাবিহা যখন এইসব চিন্তা করছিল তখন কায়সারের সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলে সেই মেয়েটাকে তার কাছে বসে কাঁদতে দেখে খুব অবাক হল। মেয়েটা যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য চোখ অল্প একটু ফাঁক করে তাকে দেখতে লাগল। কয়েক সেকেণ্ড দেখে তখন আবার তার ডালিয়ার কথা মনে পড়ল যদিও ডালিয়ার সঙ্গে তার একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য আলাপ হয়েছিল, সে সময় দু-তিন বার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল, এই মেয়েটা অনেকটা ডালিয়ার মত দেখতে। কিন্তু ডালিয়ার চেয়ে এই মেয়েটা অনেক বেশী সুন্দরী। আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি এই সুন্দরীকে দেখে যেন তার আশ মিটছে না। ভাবল, এত সুন্দরী মেয়ে সত্যি তা হলে এই পৃথিবীতে আছে। পাহাড়ে মেয়েটাকে ভালভাবে দেখতে পায় নি। তার আগেই মেয়েটা ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

সে মনে মনে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টির গুণাগুণ করে ফরিয়াদ করল–"তুমি সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা ও কর্তা। তুমি সকলের মনের নেক বাসনা পূরণ করার মালিক। আমি তোমার সৃষ্টির মধ্যে একজন নাদান বান্দা। তুমি তোমার এই খুবসুরৎ বান্দীকে এই গোনাহ্গার বান্দাকে স্ত্রীরূপে দান করে ধন্য করো।" সে সাবিহার রূপ দেখে শারীরিক যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল। কিন্তু চোখের পানি রোধ করতে পারল না।

সাবিহা বাবুজীর চোখ থেকে পানি পড়তে দেখে নিজের ওড়না দিয়ে চোখ মুছে দিতে লাগল।

কায়সার আর সংযত থাকতে পারল না। অনেক কষ্টে সাবিহার হাত দুটো ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে সুবহান আল্লাহ বলে বলল, খুব পিয়াস লেগেছে, একগ্লাস পানি দেন তো।

সাবিহা বাবুজীকে তার হাত ধরে কথা বলতে শুনে খুব লজ্জা পেলেও আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, হাত না ছাড়লে পানি দেব কি করে?

কায়সার তার লজ্জা ও আনন্দ মিশ্রিত মুখের দিকে চেয়ে এবং সুমিষ্ট গলার দরদভরা কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে আপ্লুত হয়ে ধরা হাত দুটো নিজের ছিঁড়ে যাওয়া দুগালে চেপে ধরে বলল, বেঁচে আছি বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করে বুঝতে পারছি, আল্লাহ্ পাকের কি কুদরত? অত উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার পরও তিনি আমাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখেন নি, দয়া করে এই গোনাহগার বান্দাকে তাঁর বেহেস্তের হুর সম একজনকে দিয়ে সেবা করিয়ে ধন্য করেছেন। সে জন্যে তাঁর পাক দরবারে জানচ্ছি শতকোটি শুকরিয়া। আপনার নামটা জানতে পারি?

সাবিহা বাবুজীর কথা শুনে আনন্দে মোহিত হয়ে নিজেকে সামলাতে পারছে না। একে হাত ধরতে তার দেহে ও মনে অজানা এক ভয়মিশ্রিত আনন্দের লহরী বয়ে যাচ্ছিল, তারপর তার কথা শুনে সেই আনন্দের লহরী শতগুণ প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। কাঁপা ঠোঁটে কোন রকমে বলল, আমার নাম সাবিহা। এবার হাত ছাড়ুন, পানি খাবেন বললেন।

কায়সার হাত না ছেড়ে গালে চেপে ধরে বলল, আপনার নরম হাতের ছোঁয়ায় ও আপনার মধুর কণ্ঠের কথা শুনে এবং সর্বোপরি আপনার রূপসুধা পান করে আমার পিয়াস মিটে গেছে। সত্যি, যিনি আপনার নাম রেখেছেন তিনি ধন্য। আপনার নামের অর্থ নিশ্চয়ই জানেন?

সাবিহা আরো বেশী লজ্জা পেয়ে কথা বলতে পারল না। কেঁপে উঠে না সূচক মাথা নাড়ল।

কায়সার বলল, সাবিহা অর্থ সৌন্দর্যময়ী। আল্লাহ্ পাক সত্যি সত্যি আপনাকে সৌন্দর্যের রানী করে তৈরী করছেন। আপনার নাম সার্থক।

বাবুজীর কথা শুনতে শুনতে সাবিহা ক্রমশ লজ্জা বেশী পেয়ে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে। কোন রকমে বলল, প্লীজ ছাড়ুন। বাবার নামাজ

পড়া হয়তো এতক্ষণ শেষ হয়েছে, এবার এসে পড়বে। কায়সার তার দুটো হাতের তলায় চুমো খেয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, আল্লাহ তুমি আমার মনের বাসনা পূরণ করো। তারপর মনে মনে ভাবল, সাবিহা নিশ্চয়ই শিক্ষিত।

সাবিহা সুরাই থেকে এক গ্লাস পানি এনে বলল, বসে খেতে পারবেন?

কায়সার চেষ্টা করি দেখি বলে উঠে বসতে গিয়ে সফল হল না। ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে শুয়ে পড়ে বলল, নাহ পারলাম না। বাবুজীর কঁকানি শুনে সাবিহার চোখে পানি এসে গেল চোখ মুছে বলল, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি চামচ এনে খাইয়ে দিচ্ছি।

লুবাবা এতক্ষণ জানালা থেকে তাদের সবকিছু দেখে শুনে যা বোঝার বুঝে গেল। সাবিহার চামচ আনার কথা শুনে এসে ত্রস্তপদে নিজের রুমে চলে গেল।

সাবিহা চামচ নিয়ে এসে পানি খাইয়ে ওড়নায় মুখ মুছিয়ে দিয়ে ভিজে গলায় বলল, আমার জন্য আপনার এ রকম হল, আমাকে মাফ দিন। কথা শেষ করে মুখে ওড়না চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

কায়সার বলল, কাঁদছেন কেন? আপনি হয়তো সামান্য অন্যায় করেছিলেন। সেই জন্যে যে আমার এই অবস্থা হয়েছে, সে কথা ভাবছেন কেন? আসলে আপনাকে উপলক্ষ করে আল্লাহ পাক আমার তকদীরে এই ঘটনা লিখে রেখেছিলেন, তাই হল। এর জন্যে আপনার উপর আমার কোন রাগ বা মনে কষ্ট হয়নি। বরং এই ঘটনার ফলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এত আনন্দিত হয়েছি, যা আমি সারা জীবনে পাই নি।

কেউ আসছে বুঝতে পেরে সাবিহা নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ-মুখ মুছে বলল, এবার চুপ করুন, বাবা বোধ হয় আসছে।

দেলওয়ার সর্দার এসে বললেন, বাবুর এখনো জ্ঞান ফিরে নি বেটী?

ঃ হ্যাঁ বাবা ফিরেছে।

ঃ ঠিক আছে, তুই এবার ভিতরে যা, আমি এখানে আছি। আর শোন, তোর মাকে বল, বাবুর জন্য কি খাবার করেছে নিয়ে আসতে।

সাবিহা চলে যাবার পর দেলওয়ার সর্দার কায়সারকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবু এখন কি রকম বোধ করছেন?

কায়সার বলল, আল্লাহ পাকের রহমতে একটু সুস্থ বোধ করছি। আপনারা আমার জন্য যা করছেন, তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আল্লাহ পাক আপনাদের ভাল করুন। আপনাদের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। দেলওয়ার সর্দার বললেন, আমরা বদলা পাবার আশায় কারো উপকার করি না। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য জেনে করি।

ঃ আমার খবর আপনারা পেলেন কি করে?

ঃ আমার বেটী সাবিহা ঝর্ণা দেখেতে গিয়েছিল। সে আপনাকে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নিচে পড়তে দেখে ফিরে এসে আমাকে জানায়। আমি লোকজন নিয়ে গিয়ে আপনাকে এখানে আনি। আপনাকে দেখে আমি চিনতে পারি, আপনি সালুটিকুরের

পোস্ট মাস্টার।

ঃ জ্বী, আপনি ঠিক বলেছেন।

ঃ কিন্তু আপনি এতদূরে পাহাড়ে উঠেছিলেন কেন?

ঃ ছবি আঁকার কথা চেপে গিয়ে বলল, ঝর্ণা দেখতে এসেছিলাম।

ঃ পড়ে গেলেন কি করে?

ঃ হাঁটতে হাঁটতে গাছের শিকড়ে পা আটকে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই।

ঃ আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুকরিয়া আপনি বেঁচে গেছেন। কেউ অত উঁচু থেকে পড়ে বাঁচতে পারে না। একই বলে, রাখে আল্লাহ মারে কে? তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার দেশ কোথায়?

ঃ ঢাকায়।

ঃ এমন সময় সাবিহা মায়ের সঙ্গে একবাটি মুরগীর সুপ ও একবাটি গরুর গরম দুধ নিয়ে এল।

সাবিহার মা নাদিরা বললেন, বেটা এগুলো খেয়ে ফেল, বদনে তাগত আসবে।

সাবিহা বলল, বাবুজী তো উঠে বসতে পারবেন না, আমি চামচে করে খাইয়ে দিই।

দেলওয়ার সর্দার বললেন, তাই দে বেটী, বাবুর বদনে বহুৎ চোট লেগেছে।

সাবিহা কায়সারকে খাইয়ে দেবার পর নাদিরা বললেন, তুই থোড়া দের এখানে থাক, তোর বাবা খানা খেয়ে এলে যাবি। তারপর স্বামীকে বললেন, তুম খানা খানে চলো। তোমাকে তো বাবু কা পাশ রাহনে হোগা। আদিল নাই, টাউনমে গিয়া । রবিউল কাঁহা? উসকো তোমহারা খাটিয়ে লাকে এহাঁ বিস্তারা করনে বোলনে হোগা।

দেলওয়ার সর্দার ও নাদিয়া চলে যাবার পর কায়সার সাবিহাকে বলল, আপনি আমাকে চিরকাল ঋণে আবদ্ধ করে ফেললেন। জানি না, সে ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারব কি না। একটা কথা বলব রাখবেন?

ঃ তার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন বলুন?

ঃ সাধ্যমত হলে নিশ্চয় রাখব।

ঃ আমাকে তুমি করে বলুন।

আনন্দে কায়সার কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, তাই বলব। এবার আমারটা তোমাকে রাখতে হবে

ঃ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করব।

ঃ আমি সুস্থ হয়ে যাবার পর ঐ পাহাড়ে ছবি আঁকতে আসব। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো?

ঃ আসব।

ঃ উঁহু হল না।

ঃ কি হল না?

ঃ ওভাবে বলতে নেই।

ঃ কি ভাবে বলব?

ঃ বলবে ইনশা আল্লাহ আসব।

সাবিহা মৃদু হেসে কথাটা রিপিট করল।

ঃ গুড। মনে রেখ, মুসলমানদের সব কিছু করার আগে যেমন বিসমিল্লাহ বলতে হয়, তেমনি ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলার সময় প্রথমে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়।

ঃ আমি এটা জানতাম না।

ঃ তাই তো আমি জানিয়ে দিলাম।

ঃ সেজন্যে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ঃ তুমি নিশ্চয়ই লেখাপড়া করছো?

ঃ জ্বী, করছি।

ঃ কিসে পড়ছো ? এখানে তো স্কুল কলেজ নেই?

ঃ আমি সিলেট টাউনে মহিলা হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছি। এবারে এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে এসেছি।

ঃ তুমি যে লেখাপড়া করছ, তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। রেজাল্ট বেরোবার পর বি.এ. পড়বে নিশ্চয়ই?

ঃ পড়ব। বাবারও তাই ইচ্ছা। বি.এ.-তে এ্যাডমিশান নেবার পর আমি তো এখানে থাকব না।তখন আর আমার সঙ্গে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হবে না।

ঃ হবে।

ঃ কি করে?

ঃ তুমি বললে আমি টাউনে গিয়ে দেখা করব।

ঃ তাহলে আমি খুব খুশী হব। সেদিন আপনার ঝর্ণার ছবিটা আমি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। ছবিটা দারুণ হয়েছে। যাবার সময় দিয়ে দেব।

ঃ ওটা না পেয়ে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তুমি নিয়েছ জেনে খুব আনন্দ হচ্ছে। ছবিটা তোমার কাছে থাক। আমি আর একটা এঁকে নেব।

দেলওয়ার সর্দারের তত্ত্বাবধানে তিন-চার দিন থেকে কায়সার সুস্থ হয়ে সালুটিকুরে ফিরে এল।

দ্বিতীয়

সিলেট টাউন থেকে প্রায় বিশ মাইল উত্তরে সালুটিকুর। এটাই লাস্ট বাস স্ট্যান্ড। এখানে একটা কৃষি ব্যাংক ও একটি সোনালী ব্যাংক এবং একটি পোস্ট অফিস আছে। রাস্তার পাশে কয়েকটা মুদি দোকান ও চায়ের দোকান এবং একটা ছোট-খাটো হোটেলও আছে। সপ্তাহে একদিন হাট বসে বেশীর ভাগ চা বাগানের কুলি কামিন ও

পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ সাপ্তাহিক জিনিস-পত্র বেচাকিনার জন্য আসে। অনেকে তরী তরকারী, শুকনো বাঁশ ও লাকড়ী বাণ্ডিল করে নিয়ে আসে বিক্রি করার জন্য। আনারসের মৌসুমে পাইকেররা চাষীদের কাছ থেকে কিনে রাস্তার দুপাশে জমা করে রাখে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে কিনে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যায়। সালুটিকুর থেকে অল্প কিছুদূর উত্তরে একটি নদী আছে। নদীর ওপারের জায়গাটার নাম জৈন্তাপুর। জৈন্তাপুরের খালে বিলে প্রচুর বড় বড় কই, মাগুর ও শিঙ্গি মাছ পাওয়া যায়। সেখানকার পাহাড়ী লোকেরা এই সব মাছ ধরে এখানে বিক্রি করতে আসে। জৈন্তাপুরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়গুলো বন-জঙ্গলে ভর্তি। এখানকার অধিবাসীদের অনেকে সিলেট টাউনের আশ-পাশের গ্রামের বড় বড় চাষীদের গরু, মহিষ চাষের শেষে পালতে নিয়ে আসে। চাষবাস শুরু হবার আগে পর্যন্ত তারা সেগুলো বন-জঙ্গলের ঘাস ও গাছপালা খাইয়ে পোষে। চাষের আগে যার যার গরু-মহিষ তাদেরকে ফেরৎ দিয়ে যায়। যে কমাস তারা এদের পোষে, সে কমাসের জন্য এক একটি গরু-মহিষের জন্য বেশ কিছু টাকা পায়। গরীব পাহাড়ীদের এটা ভাল উপার্জন। জৈন্তাপুরের এক সাইডে দেলওয়ার সর্দারের এলাকা। দেলওয়ার সর্দার সরকারী লোকদের কাছে অনেক ছুটাছুটি করে এবং বহু তদবীর করে এই নদীর উপর ব্রীজ তৈরী করিয়েছেন এবং নিজের বাড়ী পর্যন্ত ট্রাক যাতায়াত করার জন্য রাস্তাও তৈরী করিয়েছেন। সালুটিকুরে তার একটা গোডাউনও আছে।

কায়সার মাস দুয়েক হল এই সালুটিকুরে পোস্ট মাস্টার হয়ে এসেছে। সে ঢাকার বীজনেস ম্যাগনেট শামসুল আলমের ছেলে। উনার একছেলে এক মেয়ে। মেয়ের ভাল নাম হোমায়রা। ডাক নাম হিমু। হিমু এবছর এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে। শামসুল আলম যেমন ধনী তেমনি দানশীল ও ধর্ম পরায়ণ। ঢাকায় নিজস্ব একটা এতিমখানা আছে। এতিমখানা দু ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে মাদ্রাসার গরীব ছেলেরা এবং অন্যভাগে স্কুল ও কলেজের গরীব ছেলেরা থাকে। এতিখানার ছেলেদের শিক্ষা শেষে তাদের কর্মসংস্থান করে দেওয়ার জন্য নিজস্ব একটা সংগঠনও আছে। নিজের ব্যবসা দেখা-শুনার সঙ্গে এতিমখানা ও সংগঠনের কাজ-কর্মও দেখাশুনা করেন। উনি এতিমখানা ও সংগঠনের লোকদের এবং ছাত্রদের কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হতে দেননি। এমন কি কোন সভা, সমিতি বা মিছিলে যেতেও নিষেধ করে দিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচনের সময় তাদেরকে বলে দেন, তোমরা যারা ভোটার হয়েছ, তারা সৎ ও ধার্মিক লোককে ভোট দিবে। যদি সেরকম লোক ভোটে না দাঁড়ায় তা হলে ভোট দানে বিরত থাকবে। কখনো লোভের অথবা হিংসার বশবর্তী হয়ে কোন দলের হয়ে কাজ করবে না এবং অনুপযুক্ত, অধার্মিক ও চরিত্রহীনকে ভোট দেবে না। এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারেও কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করবে না। শামসুল আলমের স্ত্রী আকলিমা

বেগম খুব গরীব ঘরের মেয়ে ছিলেন। শামসুল আলম তখন পূর্ণ যুবক। কামেল পাস করে ভার্সটিতে ইংলিসে অনার্স করছিলেন। সেই সময় এক রমজানের ছুটিতে বন্ধু তরীকের জেদাজেদীতে তাদের দেশের বাড়ী গাইবান্ধয় বেড়াতে যান।

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বেশ বড় দিঘি। একদিন আসরের নামায পড়ে দু বন্ধুতে দিঘীর পাড়ে একটা গাছ তলায় বসে গল্প করছিলেন। এমন সময় দিঘির ঘাট থেকে কয়েকজন বয়স্ক মেয়ের সঙ্গে একটা যুবতীকে কলসি কাঁকে করে পানি নিয়ে যেতে দেখে শামসুল আলম মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়েছিলেন।

বন্ধুর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তরীক বলল, কিরে, রোজা রেখে ঐ মেয়েটার দিকে চেয়ে রয়েছিস কেন? এমনি মেয়েদের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ, তার উপর রোজা রেখেছিস। রোজা কমজোর হয়ে যাবে না?

শামসুল আলম বললেন, তা আমিও জানি। জেনে রাখিস সব জিনিসের দুটো দিক আছে। একটা বাহ্যিক আর একটা অভ্যন্তরীণ। দেখার মধ্যেও দুটো দিক আছে। একটা কুদৃষ্টি অন্যটা সুদৃষ্টি। কুদৃষ্টিতে কোন মেয়েদের দিকে তাকান হারাম। সুদৃষ্টিতে নয়। তাই তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে কোরান-হাদিসে নিষেধ। আমার দীলের খবর আল্লাহ পাক জানেন, আমি মেয়েটিকে কুদৃষ্টিতে দেখছি না। আর আমার মনের মধ্যেও কোন কুচিন্তা হচ্ছে না। আমি মেয়েটিকে দেখে আল্লাহ পাকের নিখুৎ সৃষ্টির কথা চিন্তা করছিলাম । তোদের গ্রামেরই তো মেয়ে। মেয়েটিকে যে অপূর্ব সুন্দরী তা নয়। কিন্তু ওর চেহারার মধ্যে এমন কিছু জিনিস দেখবার মত আছে, যা আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দীরের মধ্যে থাকে।

ঃ তুই তাহলে এ্যাসট্রোলজার ?

ঃ না। এসট্রোলজার বিদ্যা থাকলেও আল্লাহর রসুল (দঃ) ঐ বিদ্যা শিখতে নিষেধ করেছেন।

ঃ তাহলে তুই ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে ঐসব কথা বললি কি করে?

ঃ ওটা অন্তর-দৃষ্টির ব্যাপার। তুই বুঝবি না। তবে এটুকু বলতে পারি সব ক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানের অনুভূতিতে অন্তর-দৃষ্টিতে অনেক কিছু জানা যায়। ওসব কথা বাদ দে, সত্যি করে বল দেখি, তুই এধরনের মেয়ে আর দেখেছিস কি না?

ঃ আমার তো তোর মত অন্তর-দৃষ্টি নেই। কতটা ভাল চিনব কি করে? তবে তোর কথা একদম অস্বীকার করছি না।

মেয়েটা গ্রামের অন্য দশটা মেয়ের থেকে অনেক সুন্দরী। তোর কথা শুনে চার-পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। বলছি শোন, সেই সময় একটা পাগলা ফকির আমাদের গ্রামে এসে বেশ কিছুদিন ছিল। ফকিরটা সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। আর রাতের বেলায় ঐ মেয়েটার বাপের কাছে গিয়ে ভাত খেত এবং ওদের

বাড়ীর সামনের রাস্তায় একটা কাঁঠাল গাছের তলায় ঘুমোতো। মাস খানেক একই ঘটনা ঘটতে দেখে গ্রামের ভাল-মন্দ ছেলে ছোকরারা মনে করল, ঐ মেয়েটার উপর ফকিরের চোখ পড়েছে। তারা একদিন ফকিরকে উত্তম-মধ্যম দেবার জন্য পাকড়াও করল। ফকির তখন হাসতে হাসতে বলল, আমি পাগল ফকির মানুষ, আমাকে মার-ধোর করে কোন লাভ হবে না। আমার রিজিক যতদিন ঐ মিয়ার বাড়ীতে আছে থাকব। তারপর চলে যাব। ফকিরের কথা শুনে অনেকে গালাগালি করে বলল, ঐ গরীব বেচারীর ঘরে তোমার রিজিক না? বেচারা নিজেই দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। গ্রামে কত ধনী লোক রয়েছে, তাদের বাড়ীতে যেতে পার না? তোমার মতলব আমরা বুঝতে পারি নি মনে করেছো? আজই এখান থেকে বিদায় হও। নচেৎ মেরে লাশ বানিয়ে ছাড়ব। হৈচৈ শুনে মেয়েটার বাপ এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, তোমরা একে কিছু বলো না। আমিই ওকে রোজ রাতে ডেকে এনে ভাত খাওয়াই যাই হোক ও নিজেই আমাকে বলেছে আজ কালের মধ্যে চলে যাবে। ফকিরটা পরের দিন চলে যায়। যাবার সময় মেয়েটার বাপকে বলে যায়, তুমি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কোন চিন্তা করো না। তোমার মেয়ে খুব ভাগ্যবতী। তুমি আল্লাহ পাকের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাইবে না আর মেয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করো না। গ্রামের কোন ছেলে তোমার মেয়ের ক্ষতি করতে পারবে না। আমার বাবা একদিন মেয়েটার বাবাকে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবার কথা বলে খরচ দিতে চেয়েছিল। তখন লোকটা বাবাকে ফকিরের কথা বলে তুই কথাটা কতটা বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, আমি কিন্তু একবিন্দু বিশ্বাস করি নি। যদি ফকিরের কথা ঠিক হত? তা হলে মেয়েটার এত রূপ ও গুণ থাকা সত্তেও এতদিন বিয়ে হচ্ছে না কেন?

ঃ তুই বল না দেখি কেন হচ্ছে না ?

ঃ ওর বাবার অবস্থা খারাপ। বড় দুভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। ওর বাবার বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। ওর রূপ গুণের কথা শুনে কত জায়গা থেকে যে সম্বন্ধ আসে তার ইয়ত্তা নেই তাদেরকে মেহমানদারী করাতে পারে না তাদের মধ্যে কেউ কেউ বৌ করতে রাজী হলেও গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা সেই ফকিরের সঙ্গে জড়িয়ে মেয়েটার নামে নানান দুর্নাম দিয়ে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেয়। ঐ যে কথায় আছে না অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

ঃ গ্রামে কি ভাল লোকজন নেই? তুইও তো ওর বিয়ের ব্যাপারে এগিয়ে যেতে পারিস?

ঃ কথাটা বলা যত সহজ কাজটা তত সহজ নয়।

ঃ সহজ-কঠিন বুঝি না, তোদের মত পয়সাওয়ালা লোকের শিক্ষিত ছেলেরা যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে না আসিস, তাহলে সমাজের উন্নতি হবে কি করে?

তরীক একটু রাগের সঙ্গে বলল, অত যদি তোর গরীবদের ওপর দরদ, তবে তুই ঐ মেয়েটাকে বিয়ে কর না দেখি? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, নীতি বাক্য অন্যকে বলা যায় বন্ধু, কিন্তু নিজে করে কেউ দেখায় না। শামসুল আলম তরীকের কথা শুনে চিন্তা করলেন, তরীক তো ঠিক কথা বলেছে। তখন তার কোরান পাকের ও হাদিসের দুটো কথা মনে পড়ল। "তুমি নিজে যা কর না, অন্যকে তা করতে বলো না। ১ তুমি নিজে যা কর না, অন্যকে তা করতে বলো না।" ২ তুমি নিজে যা পছন্দ করোনা অন্যের জন্যও তা পছন্দ করো না।" তৎক্ষণাৎ তার বিবেক বলে উঠল, অন্যকে যা করতে বলছে, তা নিজে করে দেখাও।

ঃ কিরে কিছু বলছিস না কেন?

ঃ হাদিসে আছে কিছু বলা বা করার আগে ভেবে নিতে। তাই ভেবে ঠিক করলাম, মেয়েটাকে আমি বিয়ে করব। তুই ওর আব্বার সঙ্গে কথা বল।

বন্ধুর কথা শুনে তরীক হেসে উঠে বলল, কি পাগলের মত কথা বলছিস? আমি তোর কথা শুনে একটু রহস্য করলাম।

বাদ দে ওসব কথা, আমাদের গ্রামটা কেমন লাগছে বল।

ঃ গ্রাম গ্রামই। শহরের লোকদের কিছু দিনের জন্য নিশ্চয় ভাল লাগবে। তবে সেখানে স্থায়ীভাবে থাকলে কতদিন ভাল লাগবে জানি না। বিয়ের ব্যাপারে কথাটা তুই রহস্য করে বললেও আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছি। আমাকে তো তুই চিনিস, যা বলি তা করেই থাকি।

এবার তরীক খুব অবাক হয়ে বলল, তা কি করে হয়? তোর বাবা-মা এ বিয়ে মেনে নিতে পারবেন না। তুই তাদের এক ছেলে। তাছাড়া তুই এখন লেখাপড়া করছিস।

ঃ আমার আব্বা-আম্মার ব্যাপারটা আমি বুঝবো। তোকে যা বললাম কর। আর লেখাপড়া যতটা তকদ্বীরে আছে হবে। তোকে ওসব ভাবতে হবে না।

ঃ কিন্তু আমি তো তোর এত বড় ক্ষতি করতে পারব না। তোর বাবা-মা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি কি উত্তর দিব? উনারা আমাকে কত ভালবাসেন। আমি যে উনাদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

ঃ আমার আব্বা-আম্মাকে আমি চিনি। তারা আমাকে যা কিছু বলুক বা করুক তোকে কিছু বলবে না। আর যদি কিছু বলতে যায় তখন আমি নিজের ঘাড়ে সব দোষ নিয়ে তোকে বাঁচিয়ে দেব।

ঃ তবু কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

ঃ তোর কিন্তু তুই বুঝিস। তুই যদি মেয়ের আব্বাকে বলতে না পারিস, তাহলে তোর আব্বার কাছে আমি কথাটা বলব।

ঃ তুই যখন আমার কথা শুনবি না তখন আমিই বাবাকে বলে দেখি। তরীকের বাবা

সাখাওয়াত হোসেন শুনে কিছুতেই রাজী হলেন না। শামসুল আলম কি করবে ভাবতে লাগলেন। এদিকে কথাটা কিন্তু চাপা থাকল না। এক কান দু কান করে গ্রামে অনেকের কানে পৌঁছাল। ঐ মেয়েটার নাম আকলিমা। সেও শুনল। শুনে সে মনে মনে পুলক অনুভব করল। সেদিন দিঘি থেকে পানি আনার সময় তরীক ভাইয়ের সঙ্গে একটা অচেনা ছেলে দেখে সেও সেদিকে চেয়েছিল। ফলে ছেলেটার সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়। লজ্জা পেয়ে পেয়ে আকলিমা চোখ সরিয়ে নিয়ে অন্য মেয়েদের আড়ালে আড়ালে চলে এসেছে। পরে শুনেছে , সেই ছেলেটা তরীক ভাইয়ের বন্ধু। ঢাকার বড় লোকের ছেলে। এখানে বেড়াতে এসেছে।

দশ বার দিন শামসুল আলম ওখানে ছিলেন। ঢাকায় ফেরার আগে একদিন আকলিমাদের বাসায় রওয়ানা দিলেন তার আব্বার সঙ্গে দেখা করে নিজেই কথাটা বলবে বলে। ঐদিন দু বন্ধুতে জোহরের নামায পড়ে এসে বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করতে করতে তরীকের সাড়া না পেয়ে বুঝতে পারলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শামসুল আলমের মনে আকলিমার ছবি সব সময় ভাসছে। নিঁখুতসুন্দরী না হলেও এমন সুন্দর গড়নের মেয়ে তিনি আর দেখেন নি। তরীক ঘুমিয়ে পড়তে ভাবলেন, একবার ওর আব্বার সঙ্গে কথা বলে দেখলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। উঠে লুঙ্গীর ওপর পাঞ্জাবী চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বন্ধুর সঙ্গে বেড়াবার সময় তাদের ঘর চিনেছেন।

তখন গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। তার উপর রমজান মাস। লোকজন রোজা রেখে জোহরের নামায পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আকলিমাও নামাযপড়ে কিছুক্ষণ কোরান তেলাওয়াত করে ঘুমোতে গেলে শামসুল আলমের কথা মনে পড়ায় তার ঘুম এল না। বেশ কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠোনের শেষ প্রান্তে বেড়ার গেটের পাশে একটা কাঠাল গাছের তলায় ছায়াতে বসে বসে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন। তার আব্বা গরীব হলেও তাকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়িয়েছে। স্কুলের বই-খাতা তার আব্বা দিতে না পারায় সে পড়াশুনায় ভাল হয়েও পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। পড়লে তিন বছর আগে সে এস. এস. সি. পাস করত। তার সাথের মেয়েরা পাস করেছে। তাদের সব বিয়েও হয়ে গেছে। গ্রামে তার বয়সি মেয়ে আর একটাও নেই। এমন সময় শামসুল আলমকে তাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, এত রোদের মধ্যে এদিকে কোথায় যাবে?

শামসুল আলম রাস্তা ছেড়ে আকলিমাদের গেটে দাঁড়িয়ে বললেন, বাড়ীতে কে আছেন?

আকলিমার আব্বা ঘুমোচ্ছে। আকলিমা সাড়া না দিয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে ভাল করে দেখতে লাগলেন, কি সুন্দর চেহারা। রোজা রেখে মুখটা একটু শুকনো দেখালেও যে নূর চমকাচ্ছে।

কারো সাড়া না পেয়ে শামসুল আলম আরো একটু উচ্চস্বরে আকলিমার আব্বার নাম ধরে বললেন, নাসির আলি ঘরে আছেন?

আকলিমার লজ্জা ও ভয় ভয় করছিল। তবু বেড়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আব্বা ঘুমোচ্ছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি ডেকে দিচ্ছি। তারপর তিনি যেতে উদ্যত হলেন।

শামসুল আলাম বললেন, দাঁড়ান। তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

ঃ সেটা পরেও করতে পারবেন, আগে আব্বাকে ডেকে দিই।

ঃ সে সময় আমি আর পাব না। কাল চলে যাব। তাই আপনার আব্বার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আল্লাহ্ পাকের কি মহিমা, তিনি তার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। আসলে আপনার আব্বার সঙ্গে দেখা করবো বলে এলেও আসল উদ্দেশ্য, আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করা। তাই বুঝি আল্লাহ্ পাক প্রথমে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন।

আকলিমা বুঝতে পারলেন কি জিজ্ঞেস করবে। তবু বললেন, করুন কি জিজ্ঞেস করবেন।

ঃ আপনি নিশ্চয় শুনেছেন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। তাতে আপনি রাজী আছেন কি-না বলুন। যদিও মনে হয়েছে, আপনার আব্বা-আম্মা যেখানে বিয়ে দেবেন সেখানে আপত্তি করবেন না। তবু আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার আব্বাকে কথাটা বলার আগে আপনার মতামত জানার। কারণ বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ) মেয়েদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

শামসুল আলমের কথা শুনতে শুনতে আকলিমা মনের মধ্যে এক রকমের প্রশান্তি অনুভব করলেন। তিনি যখন পাড়ার মেয়েদের মুখে প্রথম কথাটা শুনেন তখন ভেবেছিলেন, সব ছেলেরাই সুন্দরী মেয়ে দেখলে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এখন তার কথা শুনে তাকে সব ছেলেদের মত ভাবতে পারলেন না। বললেন, আল্লাহ্ পাক নর-নারীকে জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন। তিনি যার জন্য আমাকে নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে হবেই। সেখানে অমত করা শুধু আমি কেন কারোরই উচিত না। আপনি দয়া করে একটু দাঁড়ান, আমি আব্বাকে ডেকে দিচ্ছি।

ঃ থাক আর ডাকার দরকার নেই। যা জানতে এসেছিলাম, আল্লাহ্ পাক মেহেরবাণী করে তা আমাকে জানিয়ে দিলেন। এর বেশী কিছু আর আমার জানার দরকার নেই। তারপর সে সালাম জানিয়ে আল্লাহ্ হাফেজ বলে ফিরে এলেন।

আকলিমা নিজের মতামত বুদ্ধি করে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। ভাবলেন, ছেলেটা খুব বুদ্ধিমান ও ধার্মিক। আল্লাহ্ পাক কি আমার এতবড় সৌভাগ্য করবেন? অস্পষ্ট স্বরে

সালামের জবাব দিয়ে আল্লাহ হাফেজ বলে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পরেরদিন ঢাকায় ফিরে এসে শামসুল আলম আব্বা-আম্মাকে আকলিমার কথা জানিয়ে ঈদের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন।

উনার আব্বা-আম্মা ছেলেকে জানেন। যা বলবে তাই করবেই। উনারা যদি এই বিয়ে না দেন, তাহলে নিজেই গিয়ে বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে আসবে। তাছাড়া ছেলের প্রতি উনাদের আগাধ বিশ্বাস। তাদের ছেলে কোন দিন অন্যায় কোন কিছু করে নি। সে যে পাত্রী নির্বাচন করছে, সে পাত্রী যে নিশ্চয় ভাল হবে, তা উনারা জানেন।

ঈদের পনের দিন পর উনারা আকলিমাকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলেন। আকলিমা বৌ হয়ে ঘরে আসার পর শামসুল আলমের আব্বার ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠে। উনাদেরই ছেলে কায়সার আর মেয়ে হোমায়রা।

কায়সারের ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকার খুব ঝোঁক। খেলাধূলা করার সময় সে বসে বসে ছবি আঁকতো। শামসুল আলম সাহেব ও আকলিমা বেগম যেমন ধর্মের সব কিছু মেনে চলেন তেমনি উনারা ছেলে-মেয়েকেও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সেইমত অনুশীলনে মানুষ করেছেন। হোমায়রা সাবালিকা হবার পর থেকে ঘরের বাইরে বেরোবার সময় বোরখা ব্যবহার করে। ভাইবোন ছেলেবেলা থেকে কখনো নামায-রোজা কাযা করে নি।

শামসুল আলম সাহেব ছেলের ছবি আঁকার ঝোঁক দেখে আতংকিত হয়ে পড়েন। তিনি ছেলেকে হাদিসের কথা বলে বুঝিয়ে বলেন, ছবি আঁকা ভাল নয়। তবে গাছপালা, পাহাড়-পর্বত অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুমি আঁকতে পার। কোন প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামে নিষেধ। ছেলে বেলায় আব্বার কথা কায়সারের মনে খুদিত হয়ে যায়। তাই আজ পর্যন্ত যত ছবি সে এঁকেছে সেগুলো সব প্রাকৃতিক দৃশ্যের। বড় হয়ে ছবি আঁকার প্রতি এতদূর সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যে এস.এস.সি. পাস করে আর্ট কলেজে ভর্তি হয়। কিছু দিন ক্লাস করে বুঝতে পারল, এখানে মানুষের ও জন্তু জানোয়ারের ছবি না আঁকলে পাস করতে পারবে না। তাই আর্ট কলেজ ত্যাগ করে ভার্সিটিতে বি.এ.অনার্সে ভর্তি হল। কিন্তু ছবি আঁকা সে ছাড়তে পারল না। অবসর সময়ে ছবি আঁকত। এম.এ.পাস করার পর শামসুল আলম সাহেব ছেলেকে ব্যবসা দেখাশুনা করতে বলেন। কায়সার কয়েক দিন আব্বার অফিসে গিয়ে তার ভাল লাগল না। ছবি আঁকা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। শামসুল আলম সাহেব প্রথম দিকে অনেক বুঝিয়েছেন। ছবি এঁকে কি হবে? তার চেয়ে ব্যবসাপত্র দেখতে শেখ। একদিন তো তোমাকেই সবকিছু দেখাশুনা করতে হবে। এখন থেকে না দেখলে পরে পারবে কি করে? কিন্তু কায়সারের কোন পরিবর্তন নেই দেখে তিনি পরে রাগারাগি করতে থাকেন কায়সার সে সব গ্রাহ্য না করে ছবি এঁকেই চলে। তার রিডিং রুমটা ছবিতে ভরে গেছে।

একদিন আকলিমা বেগম ছেলেকে বললেন, তুই যে এরকম পাগলামি করছিস, এর পরিণতির কথা ভেবে দেখেছিস? কায়সার বলল, আমি ভেবে কি করবো? আচ্ছা আম্মা, তকদ্বীরে যা আছে তা তো হবেই, তবে আর তোমরা আমার জন্য অত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তাছাড়া আমি অন্যায় কোন কিছু করছি না।

ঃ তা করছিস না। কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ বলে একটা কথা আছে। আর তকদ্বীরের কথা যে বলছিস, তাও ঠিক। কিন্তু আল্লাহ পাক তকদ্বীরের উপর ভরসা করে বসে থাকতে বলেন নি। বলেছেন মানুষ তার কর্তব্য করে যাবে, আর তার তকদ্বীরে যা আছে তা আমি দেব।

ঃ আমিও তা জানি। তবে ব্যবসাপত্র দেখাশুনা করা আমার দ্বারা হবে না। আর ভবিষ্যতের কথা আলাহ পাক জানেন। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। তোমরা যদি ছবি আঁকা পছন্দ না কর তা হলে আমি বাড়ী থেকে চলে যাব।

আকলিমা বেগম ছেলেকে আর বেশী কিছু বলার সাহস পেলেন না। ভাবলেন, সত্যি সত্যি যদি চলে যায়। একদিন স্বামীকে ছেলের কথা জানালেন।

শামসুল আলম সাহেব শুনে খুব রেগে গিয়ে ছেলেকে বেশ রাগারাগি করলেন।

কায়সার কোন প্রতিবাদ না করে চিন্তা করল, বাড়ী থেকে চলে যাবো। কিন্তু কোথাও যেতে হলে টাকা-পয়সা অনেক দরকার। তার কাছে যা আছে তাতে আর কত দিন চলবে? শেষে ভেবে ঠিক করল, আগে একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে, তারপর চলে যাবে। এই চিন্তা করে সে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম রেজিস্ট্রী করল এবং বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। ছেলের হাবভাব দেখে আকলিমা বেগম স্বামীকে বললেন, একটা ভাল মেয়ে দেখে কায়সারের বিয়ে দিয়ে দাও। তা হলে সে সংসারি হতে পারে।

শামসুল আলম সাহেব মৃদু হেসে বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমার ম্যানেজারের ডালিয়া নামে একটা মেয়ে আছে। তাকে আমি একবার দেখেছি। ভেরী বিউটিফুল গার্ল। কলেজে পড়ে। ওরকম মিষ্টি মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। কায়সারের সঙ্গে মানাবে ভাল। দেখলে তোমারও পছন্দ হবে।

ঃ ম্যানেজারকে বলো, তিনি যেন স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন।

ঃ ঠিক আছে তাই বলবো।

কয়েকদিন পর শামসুল আলম সাহেব অফিসে ম্যানেজারকে ডেকে নিজের উদ্দেশ্যের কথা বলে বললেন, কায়সারের আম্মা ডালিয়াকে দেখতে চায়। আপনি একদিন ডালিয়াকে ও তার আম্মাকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসুন।

ম্যানেজার জাব্বার সাহেব অনেক দিন থেকে এখানে কাজ করছেন। তিনি

মালিকের সবকিছু জানেন। কায়সারের মত হীরের টুকরো ছেলে আজকালের যুগে নেই। শুনে খুশী হয়ে মনে মনে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন, আমার মেয়ের কি এত সৌভাগ্য হবে?

ঃ কার ভাগ্যে কি আছে, সেটা যিনি নির্ধারণ করেছেন তিনি জানেন। তাঁর উপর ভরসা করে আমাদের সব কিছু করা উচিত। তাহলে একদিন আসছেন তো?

ঃ জ্বী আসব।

জাব্বার সাহেব ঢাকার লোক। নাজিম উদ্দিন রোডে পৈতৃক ভিটের উপর পাঁচতলা বাড়ী করেছেন। বিয়ের পাঁচ বছর পর উনার স্ত্রী আতিয়া বেগম দুটো জমজ মেয়ে প্রসব করেন। মেয়ে দুটো দেখতে প্রায় একই রকম। উনারা তাদের নাম রাখেন রাফিয়া ও ডালিয়া। রাফিয়া জন্মাবার তিন ঘণ্টা পর ডালিয়া হয়। যখন তাদের বয়স চার বছর তখন পুত্র সন্তানের জন্য জাব্বার সাহেব স্ত্রী ও দু মেয়েকে নিয়ে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রঃ)-এর ওরশ মোবারকে এসে উনার মাযার জিয়ারত করেন। তারপর ফাতেহা পাঠ করে উনার রুহ পাকের উপর বখশে দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোওয়া করলেন, হে আল্লাহ তোমার হাবিবে পাকের উপর শতশত দরুদ ও সালাম পেশ করে ফরিয়াদ করছি, তুমি আমাদেরকে দুটি মেয়ে সন্তান দান করে ধন্য করেছ। আমরা তোমার কাছে আর একটা পুত্র সন্তান কামনা করি। দুটো মেয়ে না দিয়ে যদি একটা ছেলে দিতে তা হলে আমরা আর চাইতাম না। তুমি দয়ার সাগর। তুমি সেই দয়া থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। আমরা তোমার রাস্তায় একহাজার টাকা দান করব। তোমার এক প্রিয় বান্দার রওজা মোবারকের সামনে দোওয়া করছি, তুমি আমাদের দোওয়া কবুল কর, আমিন। তারপর জোহরের নামায পড়ে স্ত্রী ও মেয়েদের কাছে ফিরে এলেন। তাদেরকে মেয়েদের নামায পড়ার জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে বললেন, কি ব্যাপার কাঁদছ কেন? রাফিয়াকে দেখতে না পেয়ে আতংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রাফিয়া কোথায়। আতিয়া বেগম কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি ওদেরকে দুপাশে বসিয়ে নামায পড়ছিলাম, সালাম ফিরিয়ে রাফিয়াকে পাচ্ছি না।

জাব্বার সাহেব অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে মাজার শরীফের ভলেন্টীয়ারদের জানালেন। তারাও অনেক সন্ধান চালাল। কিন্তু কিছুই হল না। ওরশের সময় প্রচণ্ড ভীড় হয়। অত ভীড়ের মধ্যে ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মাইকেও অনেকবার মেয়ের বয়স, চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিয়ে এনাউন্স করা হল কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। কয়েকদিন সিলেট থেকে দুবোন একই রকম দেখতে বলে ডালিয়ার ফটো তুলে খবরের কাগজে সেই ফটো ছাপিয়ে প্রতিদিন হারানো বিজ্ঞপ্তী দিলেন। বিজ্ঞপ্তীতে সিলেটের ও ঢাকার ঠিকানা দিলেন। মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য

বিশ হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করলেন। শেষে কোন কিছুতেই মেয়ে না পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন।

আতিয়া বেগম কেঁদে কেঁদে বেশ কিছু দিন বিছানা থেকে ওঠেন নাই। পরে আস্তে আস্তে সামলে নিয়েছেন। কিন্তু প্রায় রাফিয়ার জন্য কাঁদেন। সিলেট থেকে ফেরার একবছর পর তাদের একটা ছেলে হয়। তার নাম মুবিন। সে ক্লাস এইটের ছাত্র। আর ডালিয়া এইচ. এস. সি.-র শেষ বর্ষে।

এক ছুটির দিন জাব্বার সাহেব স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সাহেবের বাসায় এলেন। ঐদিন বাসায় স্ত্রীকে সাহেব ও বেগম সাহেবের কথা বলেছিলেন। শুনে আতিয়া বেগমও খুব খুশী হয়েছেন। আব্বা যখন আম্মাকে ঐ কথা বলছিল তখন ডালিয়াও আড়াল থেকে শুনে। সে সময় তার মনে এক ধরনের এ্যাংজাইটি অনুভব করে চিন্তা করল, আব্বার সাহেবের ছেলে দেখতে কেমন কি জানি। আজ আসবার সময় তার সেই অনুভূতিটা প্রবল হল।

ডালিয়াকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে আকলিমা বেগমের খুব পছন্দ হল। আপ্যায়নের পর তাকে সঙ্গে করে নিজের রুমে এনে বললেন, তুমি লেখাপড়া করছ, দু একটা কথা বলব কিছু মনে করো না। তোমার আব্বা-আম্মা তোমাকে কিছু বলেছে কিনা জানি না, আমরা তোমাকে বৌ করতে চাই। সেই জন্যে তোমাকে আনিয়েছি। যদিও জানি তোমার আব্বা-আম্মার মতামতই সব, তবু আমি তোমার মতামত জানতে চাই। কারণ প্রত্যেক ছেলেমেয়ের নিজস্ব একটা মতামত থাকে। কোন পিতামাতারই উচিত না, ছেলেমেয়ের মতামত না নিয়ে তাদের বিয়ে ঠিক করা। তাই বলছিলাম, তোমার যদি দ্বিমত না থাকে, তা হলে তুমি আমাদের কায়সারের সঙ্গে আজ আলাপ করে পরে তোমার আব্বা-আম্মাকে জানিও। আমি মনে করি ছেলেমেয়ে দুজনের একজনের অমতে বিয়ে হলে তা যেমন শুদ্ধ হয় না, তেমনি দাম্পত্য জীবনে শান্তি পায় না। আমাদের কায়সারকে কি তুমি চেন?

ডালিয়া লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে বলল, জ্বী না।

ঃ সে তার রিডিং রুমে আছে। তুমি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ কর। কথা শেষ করে একটা কাজের মেয়েকে ডেকে বললেন, একে কায়সারের রুমে নিয়ে যাও।

ডালিয়া চিন্তা করতে লাগল, যাকে কখনো দেখি নি তার সঙ্গে কিভাবে আলাপ করবো?

তাকে ভাবতে দেখে আকলিমা বেগম বললেন, যাও মা কি ভাবছ? ডালিয়া দ্বিধা চিত্তে কাজের মেয়ের সঙ্গে এগোল।

কাজের মেয়েটা দোতলার একটা রুমের দরজার কাছে গিয়ে বলল, ছোট সাহেব ভিতরে ছবি আঁকছেন, আপনি যান।

কাজের মেয়েটা চলে যাবার পর ডালিয়া পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে অবাক। পুরো রুমটা ছবিতে ভর্তি। পা-পা করে সে ছবিগুলো দেখতে লাগল। সমস্ত ছবিগুলো গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, হ্রদ, নদ-নদী, ঝর্না, সমুদ্রের দৃশ্য, ফসল ভরা মাঠ, কাবা শরীফ ও মদিনার হজরত মোহাম্মদ (সঃ) এর রওজা মোবারকের। কোন প্রাণীর বা মানুষের ছবি একটাও দেখতে না পেয়ে আরো বেশী অবাক হয়ে চিত্রকরকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু পেল না। চিন্তা করল, খালাআম্মা বললেন, এখানে আছে, কাজের মেয়েটাও তাই বলে গেল তাহলে হয়তো সবায়ের অগোচরে বাইরে গেছে। এই কথা চিন্তা করে সে ফিরে আসার জন্য দরজার দিকে এগোল। এমন সময় একটা চব্বিশ পচিশ বছরের সুন্দর যুবককে পর্দা ঠেলে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। কায়সার বাথরুমে গিয়েছিল। ফিরে এসে একটা সুন্দরী যুবতীকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভাবল, মেয়েটা কে হতে পারে? আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। হয়তো হিমুর বান্ধবী? জিজ্ঞেস করল, কে আপনি?

ডালিয়া কায়সারকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়েছিল। কায়সার তার দিকে চেয়ে কথা বলতে চোখে চোখ পড়ে গেল। বলল, আমিও তো একই প্রশ্ন করতে পারি?

ঃ তা পারেন। তবে এটা আমার রুম। জিজ্ঞেস করার অধিকার আমার বেশী।

ঃ আপনার কথাও ঠিক। তবে আগন্তুককে প্রশ্ন করার অধিকার সবারই আছে।

মেয়েটা যে বুদ্ধিমতী কায়সার তা বুঝতে পেরে বলল, আমার পরিচয় তো বললাম, এবার আপনারটা বলুন।

ঃ আমি ডালিয়া। সমনে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা দেব, আব্বা-আম্মার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

কায়সার আব্বা-আম্মার অভিসন্ধি যেন একটু বুঝতে পারল। বলল, আলাপ তো হলই, আপনি এখন আসতে পারেন। এবার আমি একটা কাজে হাত দেব।

ঃ আমি থাকলে আপনার কাজে বুঝি ব্যাঘাত ঘটবে?

ঃ আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না, বরং আপনার মনে ব্যাঘাত ঘটবে।

ঃ কথাটা বুঝতে পারলাম না।

ঃ না বোঝারই কথা। কি জানেন, আমি কাজে হাত দিলে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কেঊ যে এখানে আছে সে কথা ভুলে যাব। তখন আপনি আমাকে অভদ্র মনে করবেন।

ডালিয়া মৃদু হেসে বলল, তাই?

ঃ হ্যাঁ তাই। এবার তা হলে আসুন বলে কায়সার ছবি আঁকতে শুরু করল।

ডালিয়া বেশ কিছুক্ষণ তার ছবি আঁকা দেখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, এত যে ছবি আঁকছেন, তাতে আপনার কি লাভ হচ্ছে? কায়সার অবাক হয়ে বলল, আপনি

এখনো যান নি?

ঃ তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। যা জিজ্ঞেস করলাম উত্তর দেবেন না?

ঃ লাভ-ক্ষতি চিন্তা করে আমি ছবি আঁকি না। এটা আমার হবি। ছোটবেলা থেকে আমি ছবি আঁকি। তারপর তিনটে ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ঐগুলো বিদেশে পুরস্কার পেয়েছে।

ঃ আপনি কোন মানুষ বা প্রাণীর ছবি আঁকেন না কেন?

ঃ ইসলামে নিষেধ বলে।

ঃ কিন্তু আমি তো জানি ধর্ম মেনে চললে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

ঃ তা আমিও জানি। কিন্তু বিশ্বাস করি না। আমার ছবিগুলো দেখে কি আপনার তাই মনে হয়?

ঃ না তা মনে হচ্ছে না। তবে আপনি হয়তো আরো বড় আর্টিস্ট হতে পারতেন।

ঃ আমি বড় আর্টিস্ট হতে চাই নি। বললাম না, এটা আমার হবি। মুসলমানদের কাছে ধর্ম সবার আগে। যে কোন কাজ করার আগে প্রত্যেক মুসলমানকে ধর্মের আইনের কষ্টিপাথরে যাঁচাই করে দেখা কর্তব্য। আমরা তা করছি না বলে আমাদের সমাজের এত অবক্ষয়।

এরপর ডালিয়া আর কিছু বলতে পারলো না। আব্বার গাড়ী নিয়ে স্টেডিয়ামে একটা বই কিনতে গিয়েছিল। ফিরে এলে শামসুল আলম সাহেব ম্যানেজার ও তার স্ত্রী এবং মুবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সালাম ও কুশলাদির পর্ব শেষ করে দোতলায় নিজের রুমে যাবার সময় ডালিয়াকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, কিরে তুই এখানে? কার সঙ্গে এলি ? কতদিন নিয়ে আসতে চেয়েছি, আসিস নি।

ডালিয়া ও হিমু একই কলেজে একসঙ্গে পড়ে। খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী না হলেও ক্লাসমেট হিসাবে বেশ ভাব। তাকে কয়েকবার হিমু বাসায় নিয়ে আসতে চেয়েছে, ডালিয়া আসে নি। ডালিয়া যেমন জানে না তার আব্বা হিমুর বাবার অফিসের ম্যানেজার, তেমনি হিমুও জানে না, তার আব্বা ডালিয়ার আব্বার সাহেব।

হিমুর কথা শুনে ডালিয়া বলল, আব্বা-আম্মার সঙ্গে এসেছি।

তুই তাহলে আব্বার সাহেবের মেয়ে?

হিমু বলল, আমিও তো জানতাম না, তুই আব্বার অফিসের ম্যানেজারের মেয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলি কেন?

ঃ তোর ভাইয়ার আঁকা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম।

ঃ কেমন দেখলি?

ঃ তোর ভাইয়া একজন ভাল আর্টিস্ট।

ঃ আর্টিস্টকে দেখিস নি?

ঃ দেখিছি।

ঃ পরিচয় হয় নি?

ঃ হয়েছে।

ঃ কেমন মনে হল?

ঃ কেমন আবার মনে হবে ভালই তো।

ঃ ভাববার মত কিছু মনে হল না কি?

ঃ ডালিয়া চোখ পাকিয়ে বলল, ফাজলামি করছিস?

ঃ ফাজলামির কথা কি বললাম, কাউকে মনে ধরলে তার কথা ভাবাই তো স্বাভাবিক।

ঃ এখনো ভাববার মত মনে ধরে নি।

হিমুও ভাইয়ার বিয়ে দেবার কথা শুনেছে। বলল, যখন ধরবে তখন বলিস, আমি তোকে হেল্প করব। এখন চল আমার রুমে চল। রুমে এসে হিমু ডালিয়াকে বলল, জানিস ভাইয়াটা দিন দিন ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সেই জন্য আব্বা-আম্মা তার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

ডালিয়া বলল, তোর ভাইয়া ছবি আঁকার পাগল দেখলাম। কোন মেয়ে জেনে-শুনে ওমন পাগল বিয়ে করতে রাজি হবে না।

ঃ অন্যের কথা বাদ দে, তুই রাজী আছিস কি না বল? তুই ভাবী হলে যা মজা হবে না, বলে তাকে জড়িয়ে ধরল।

ঃ আরে ছাড় ছাড়, এখনো ভাবী হই নি, তাতেই এত? হলে কি করবি কি জানি।

হিমু ছেড়ে দিয়ে বলল, তুই ভাইয়ার ছবি আঁকার রোগ ঠিক সারাতে পারবি।

ঃ কি করে বুঝলি?

ঃ তুই যে রকম ফরওয়ার্ড মেয়ে, দেখিস যা বললাম তা করতে পারবি। বল না, ভাইয়াকে তোর পছন্দ হয়েছে কি না?

ঃ তুই তো দেখছি আর এক পাগল। তোর ভাইয়াকে আজই মাত্র দেখলাম। তেমন ভালভাবে আলাপও হয়নি। আর তুই কিনা এক্ষুনী আমার মতামত জানতে চাইছিস?

ঃ ঠিক আছে বাবা আরো কয়েকবার দেখ, আলাপ কর, তারপর না হয় জানাস।

ডালিয়া হেসে উঠে বলল, তাই জানাব। এখন চল, আব্বা-আম্মা কি মনে করছে কি জানি?

উভয় পক্ষের মতামতে পরীক্ষার পরে বিয়ের দিন ঠিক হল। তারপর থেকে হিমু কলেজে ডালিয়াকে যেমন নানা রকম ইর্য়াকি করে জ্বালায়, তেমনি বাসায় দূর থেকে কায়সারকে বিয়ের কথা বলে বিরক্ত করে। কাছে যেতে সাহস করে না। সে জানে কাছে গেলে ভাইয়া তার পিঠে কয়েকটা কিল তো মারবেই তার ওপর কান মলে দেবে।

এরকম উপহার হিমু ছোটবেলা থেকে ভাইয়ার কাছ থেকে পেয়ে আসছে। আজও সেই পাওয়া শেষ হয় নি।

প্রথম প্রথম কায়সার ছোট বোনের কথা পাত্তা দেয় নি। মাঝে মাঝে শুধু শাসিয়েছে। কয়েক দিন ধরে যখন হিমুকে কথাটা বলতে শুনল তখন একদিন তার রুমে গিয়ে পাকড়াও করে বলল, সত্যি করে বলতো ব্যাপার কি?

হিমু ভয়ে ভয়ে বলল, আগে প্রতিজ্ঞা কর, আমাকে মারবে না।

ঃ ঠিক আছে প্রতিজ্ঞা করলাম মারব না।

ঃ সেদিন ডালিয়া নামে যে মেয়েটা তোমার রুমে গিয়ে আলাপ করল, সে আমার সাথে পড়ে। আব্বার অফিসের ম্যানেজারের মেয়ে। আব্বা-আম্মা ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছে। রাগের সঙ্গে ভাইয়াকে তার দিকে চাইতে দেখে ভয়ার্তস্বরে বলল, এতে আমি কি দোষ করলাম? তুমি জানতে চাইলে তো বললাম।

কায়সার সংযত হয়ে বলল, আমিও দেখব, কেমন করে আমার বিয়ে দেয়। এরপর সে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে তার চাকরির ব্যাপারে উঠে পড়ে তদবীর করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে সিলেটের সালুটিকুর পোস্ট মাস্টারের চাকরি পেয়ে বিয়ের কয়েক দিন আগে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এসেছে।

তৃতীয়

পাড়াগাঁয়ের পোস্ট অফিসের সম্বন্ধে কায়সারের কোন জ্ঞান ছিল না। এসে যা দেখল, তাতে তার চক্ষু চড়কগাছ। ছোট্ট টিনের ঘর। একজন মাত্র পিয়ন। আর কোন কর্মচারী নেই। একটা বড় মত টেবিল ও দুটো নড়বড়ে চেয়ার। একটা ঘুনে খাওয়া আলমারী। আলমারীর মাথায় ফাইলগুলো ধুলোতে ভর্তি। আগের পোস্ট মাস্টার একজন বুড়ো লোক ছিল। হঠাৎ ডায়রিয়া হয়ে মারা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি সেই পোস্টে কায়সারকে দেওয়া হয়েছে। কায়সার ঢাকা থেকে এসে একরাত সিলেট টাউনে একটা হোটেলে রইল। পরের দিন সকালে হোটেলের মালিকের কাছ থেকে সবকিছু জেনে বেলা দশটার সময় কর্মস্থলে এসে পৌছে পিয়নের কাছ থেকে কাজ-কর্ম বুঝে নিল।

পিয়ন তারই বয়সি একজন কর্মঠ যুবক। নাম কংকর। এস. এস. সি. পাস। বেশ ভদ্র। নতুন পোস্ট মাস্টারকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিল। মাইল তিনেক দক্ষিণে পাহাড়ী গ্রামে তার বাড়ি। প্রতিদিন সকাল নয়টায় আসে আর পাঁচটায় বাড়ি ফিরে যায়। সে সকালে বাড়ি থেকে টিফিন বক্সে দুপুরের খাবার নিয়ে আসে।

জোহরের আযান শুনে কায়সার বলল, আমি নামায পড়ে আসি, তুমি ততক্ষণে খেয়ে নাও।

কংকর বলল, আপনি খাবেন না?

ঃ এখানে বোধহয় তেমন ভাল হোটেল নেই?

ঃ তেমন ভাল না থাকলেও আছে। আপনি কি সেখানে খেতে পারবেন?

ঃ নামায পড়ে আসবার সময় দেখবনে। যদি ভাত খেতে না পারি, তাহলে অন্য কিছু খেয়ে নেব। রাত্রে টাউনে গিয়ে ভাত খাব।

ঃ আপনি প্রতিদিন অতদূর যাতায়াত করবেন কি করে? তাছাড়া বাস ঠিক মত সব সময় প্রতিদিন পাওয়া যায় না।

ঃ অন্য কোন উপায় যখন নেই তখন আর কি করা যাবে।

ঃ আপনি যদি বলেন, তাহলে ব্যাংকের লোকদের সঙ্গে একটা ঘর ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।

ঃ তাই করো। আমি এখন নামায পড়ে আসি বলে কায়সার মসজিদে গেল।

কংকরের এক চাচার ঢাকায় কাপড়ের দোকান আছে। কংকর তার কাছে থেকে এস. এস. সি. পাস করেছে। তাই সে পাহাড়ী হলেও ভাল বাংলা বলতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে কংকর একটা ভাড়া বাসা ঠিক করে দিল। টিনের সেড একরুম। রান্না করার জন্য একটা আধা বয়সী কাজের মেয়েরও ব্যবস্থা করল।

কায়সারের প্রথম প্রথম সেই মেয়ের হাতের রান্না খেতে বেশ অসুবিধে হত। এখানের পানি একটু লালচে। পানি খেয়েও তৃপ্তি পেত না। ক্রমশ সে এগুলোতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ল। অফিসের ছুটির পর প্রথম কয়েকদিন আশেপাশের জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তার কাছে খুব ভাল লাগল। শহরের মত কোন কোলাহল নেই। বড় বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক পাহাড় ঘন বন-জঙ্গলে ভরা। অনেক পাহাড়ের বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে পাহাড়ী লোকেরা নানা রকম ফসল ফলাচ্ছে। আবার অনেক পাহাড়ে আনারস গাছের চারা লাইন করে লাগিয়েছে। গাছগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন পাহাড়গুলোকে দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

একদিন কায়সার নদী পার হয়ে জৈন্তাপুর গিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় দেখতে পেল, দূরে একটা পাহাড়ের মাথা থেকে পানির ধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে। কায়সার বুঝতে পারল এটা ঝর্না। সে এতদিন ছবিতে ঝর্নার দৃশ্য দেখেছে। আজ সত্যিকার ঝর্না দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। কাছে যাবার শত চেষ্টা করেও সফল হল না। যাবার কোন পথ নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড়গুলো আবার বন-জঙ্গলে ভরা। বেলা বেশি নেই দেখে সেদিন ফিরে এল। পরের দিন কংকরকে সেই পাহাড়ী ঝর্নার কাছে কিভাবে যাওয়া যায় জিজ্ঞেস করল।

কংকর বলল, স্যার ওখানে কখনো যাবার চেষ্টা করবেন না। ওখানে যে যায়, সে

আর ফিরে আসে না। শহরের অনেক বাবু ঐ ঝর্না দেখতে গিয়ে আর ফিরে আসে নাই।

ঃ কেন আসে নাই বলতে পার?

ঃ ঐ এলাকায় যারা বাস করে তারা একেবারে অসভ্য। সভ্য সমাজের মানুষকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। ভীষণ রাগী। চাষ-বাস করে যা ফসল পায় তা দিয়ে এবং বন-জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে ওরা জীবন ধারণ করে। মেয়ে-পুরুষ সবাই গাছের ছাল বা পাতা দিয়ে শুধু লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে।

ঃ তা তারা যাই হোক না কেন, কিন্তু ঝর্না দেখতে মনে কেউ ফিরে আসে না কেন?

ঃ ঐ ঝর্নাটা ভারতের বর্ডারে। ঝর্নাকে কাছে দেখতে মনে হলেও অনেক দূরে। ঝর্নার পাহাড়টার নাম ভোলাগঞ্জ পাহাড়। ওর আশে-পাশে ভারতের সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। ওদের নাগালের মধ্যে গেলে টহলদার সৈন্যরা গুলি করে মেরে ফেলে। আর তা না হলে অসভ্য জংলীরা ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে। ভারতের সীমান্ত রক্ষীদের সঙ্গে ঐ এলাকার জংলীদের প্রায় যুদ্ধ হয়। জংলীদের তো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। তারা তীর ধনুক নিয়ে পাহাড়ের বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে ওদেরকে তীর ছুঁড়ে হত্যা করে। ওদের তীরের ফলকে বীষ মাখান থাকে। যার গায়ে তীর বিধবে, সে বিষের ক্রিয়ায় মারা যায়। আপনি কোনদিন ঐ দিকে বেশি দূর যাবেন না। তবে জৈন্তাপুরে বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে আমাদের স্বগোত্রীয় লোকেরা বসবাস করে। তারা ওদের মত অসভ্য ও বর্বর নয়।

কায়সার বলল, আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি ঐ ঝর্না দেখতে আমার যে খুব ইচ্ছা করে। তুমি কোন দুঃচিন্তা করো না। আমি ঝর্নার কাছে না গিয়ে দূর থেকে দেখব।

ঃ তা হলে কথা দিন, ঐদিকে যেদিন যাবেন, সেদিন আমাকেও সঙ্গে নেবেন?

ঃ আচ্ছা কংকর আমার জন্য তোমার এত ভয় কেন?

ঃ কি বলব স্যার, আপনার মত এত ভাল লোক আমি জীবনে দেখি নি। ধর্মের ধার দিয়েও চলে না। আমাদের এখানে বুড়ো লোকেরা ছাড়া কেউ নামায পড়ে না। ধর্মের ধার দিয়েও চলে না। মসজিদে তো নামায পড়তে যান, কই কোন যুবক ছেলেকে নামায পড়তে দেখেছেন? আপনাকে নামায পড়তে দেখে এখানকার যুককেরা কত হাসাহাসি করে। বলে নামায-টামায বুড়ো বয়সের ব্যাপার। মরার আগে এসব করতে হয়। তাদের কথা শুনে আমি একদিন তাদেরকে বলেছিলাম, শহরে ছোট বড় সবাই নামায পড়ে। তখন ওরা আমাকে যা-তা বলে উপহাস করেছে। আসল কথা কি জানেন স্যার, শিক্ষা নেই বলে ওরা ঐরকম বলে।

ঃ তুমি অতি সত্য কথা বলেছ। আমাকে একটু সামলে উঠতে দাও। আমি এখানে একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। তাতে করে সবাই সবকিছু জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

ঃ তাহলে তো স্যার, খুব ভাল হয়।

ঃ তার আগে তোমাকে আমি নামায পড়া শিখিয়ে নামায ধরাব।

ঃ ঠিক আছে, প্রতিদিন ছুটির পর তোমাকে শেখাব। এখন বল তোমার নাম কে রেখেছিল?

ঃ আমার দাদা।

ঃ তোমার দাদার নাম কি?

ঃ ফুয়াদ হাসান।

ঃ তোমার ভাল নাম কি?

ঃ তমিজ।

ঃ আমি কিন্তু তোমার নাম শুনে প্রথমে তোমাকে হিন্দু বা বৌদ্ধ মনে করেছিলাম। পরে তোমার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার দেখে-শুনে মুসলমান বলে জানতে পারি। তোমার এই কংকর নামের অর্থ জান?

ঃ পাথরের ছোট ছোট টুকরোকে কংকর বলে।

ঃ তাহলে তুমি অত ভীতু কেন?

ঃ আমি ভীতু আপনি বুঝলেন কি করে? আমাদের গোত্রের ছোট বড় সকলে আমাকে ভয় করে।

ঃ তাই নাকি? তাহলে আমাকে ঝর্না দেখতে যেতে ভয় দেখিয়ে নিষেধ করলে কেন?

ঃ ঐখানে গেলে আপনার বিপদ হবে জেনে। আমার যতই শক্তি ও সাহস থাকুক না কেন, ঐ এলাকায় তা অচল।

ঃ তোমার বাবা কি করেন?

ঃ সিলেট টাউনে বাবার রেডিমেট কাপড়ের দোকান আছে।

ঃ তোমাদের অবস্থা তো তাহলে ভাল। তুমি আরো লেখাপড়া করলে না কেন?

ঃ তকদ্বীরে নেই বলে। ইচ্ছা ছিল অনেক লেখাপড়া করব। কিন্তু ঘরে যার সৎ মা থাকে, তাদের কপাল মন্দ। সৎ মায়ের কথায় বাবা আমাকে পড়াইতেই চায় নি। সে কথা চাচা জানতে পেরে লেখাপড়া শিখিয়েছে। চাচার খুব ইচ্ছা ছিল আরো লেখাপড়া করিয়ে তার মেয়েকে আমার হাতে তুলে দেবে। আমার চাচাত বোনের নাম মিতালি। আমি যে বছর এস. এস. সি. পাস করি তার দু বছর পর সেও পাস করে। আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসতাম। আমাদের মেলামেশা দেখে চাচি চাচাকে বলল, কংকরকে আর এখানে রাখা যাবে না। মিতালি বড় হচ্ছে। এবার তোমার ভাইপোকে দেশে পাঠিয়ে দাও। চাচা শুনে তার মনের ইচ্ছার কথা বলে। চাচি আমাদের মেলামেশা দেখে এমনি রেগেছিল, তার উপর চাচার কথা শুনে আরো রেগে গিয়ে বলল, আমি মিতালিকে আরো লেখাপড়া করিয়ে শহরে বড় ঘরে বিয়ে দেব। তারপর প্রায় প্রতি রাতে আমাকে নিয়ে

চাচা-চাচির মধ্যে ঝগড়া হত। চাচির ভয়ে মিতালির সঙ্গে আমি আর মিশতাম না। তাকে শুধু সকালে পড়াতাম। রাত্রে পড়তে আসত না। মিতালি মাঝে মাঝে আমার দুটো হাত ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলত, কংকর ভাই, তুমি আমাকে ফেলে দেশে চলে যেও না। আমারও তখন চোখ দিয়ে পানি পড়তো। ভেবে কিছু ঠিক করতে পারতাম না। দেশে সৎমা, এখানেও চাচি বিমুখ। কোন উপায় না দেখে শুধু বলতাম, মিতালি ধৈর্য ধর। আমি রোজগার করতে পারলেই তোমাকে যেমন করে হোক বিয়ে করবই।

ঃ কত বছর এই চাকরি করছ?

ঃ প্রায় পাঁচ বছর হবে।

ঃ বিয়ে করেছ?

ঃ জ্বী করেছি।

ঃ নিশ্চয় সেই মিতালিকে?

ঃ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে মাথা নেড়ে সায় দিল।

ঃ এতে লজ্জার কি আছে? তোমরা দুজন দুজনকে ভালবাসতে। স্বাবলম্বি হয়ে বিয়ে করেছ, এটা তো গর্বের কথা। তোমার সৎমা বৌকে কিছু বলে না?

ঃ না। সৎমার কোন ছেলেমেয়ে হয় নি। এখন আমাদেরকে খুব ভালবাসে।

ঃ তোমার চাচির অমতে মিতালিকে বিয়ে করলে কি করে?

ঃ চাচা মিতালিকে নিয়ে কাজী অফিসে এসে বিয়ে পড়িয়ে আমাদেরকে বাসায় নিয়ে যায়। চাচি চাচার মুখে সবকিছু শুনে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে আমরা তার পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে মানিয়ে নিলাম। এখন আর কোন গোলমাল নেই।

ঃ যাক শুনে খুশী হলাম। দোওয়া করি আল্লাহ তোমাদের সুখী করুক।

এক ছুটির দিন কায়সার কংকরকে নিয়ে সে ঝর্না দেখতে জৈন্তাপুরে রওয়ানা হল। কাঁয়সারের মনে হল কংকর না থাকলে সে হয়তো আসতো না। যে রাস্তাটা নদী পার হয়ে জৈন্তাপুরের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে কিছুদূর আসার পর তারা পাহাড়ী সরু রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর কংকর একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বলল, এখান থেকে ঝর্নাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর বেশী এগোনো ভাল হবে না। এটাই নিরাপদ স্থান। কায়সার ফ্লাক্সে করে চা ও এক প্যাকেট বিস্কুট এনেছে। বলল, এখানে বসে চা খেতে খেতে ঝর্না দেখা যাক। সেদিন বেশ কিছুক্ষণ সেখানে ঝর্না দেখে ও গল্প করে ফিরে এল। তারপর থেকে প্রতি ছুটির দিন কায়সার সেই পাহাড়ে গিয়ে ছবি আঁকতে লাগল। বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা একদিন কায়সার ঐ পাহাড়ে এক মনে ছবি আঁকছে। হঠাৎ শুকনো গাছের পাতা কেউ মাড়লে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শুনতে পেয়ে চার-পাশে তাকিয়ে দেখল। কোন কিছু দেখতে না

পেয়ে ভাবল, শব্দটা কিসের হতে পারে? মানুষ-জন যখন দেখছি না তখন কোন বন্য প্রাণীর পায়ের শব্দ হবে। কিন্তু কংকর যে বললে, এখানে কোন হিংস্র জন্তু নেই। আর একবার ভাল করে চা খাবে বলে ফ্লাস্কের কাছে এসে অবাক। ফ্লাস্কের পাশে রাখা বিস্কুটের প্যাকেটটা নেই। বেশ কয়েক দিন সে এখানে ছবি আঁকতে আসছে। প্রতিবারে সে ফ্লাস্কে করে চা ও এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে আসে। ছোটবেলা থেকে সে শুধু চা খেতে পারে না। কিছু না হলেও বিস্কুট চাই-ই। ভাবল, আজ কি বিস্কুটের প্যাকেট আনতে ভুলে গেছি? কিন্তু তা কি করে হয়? স্পষ্ট মনে রয়েছে এখানে এসে ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে চায়ের সঙ্গে খেয়ে ছবি আঁকতে শুরু করি। তা হলে কি কোন জন্তু বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে পালিয়ে গেল। সেই শব্দ হয়তো শুনেছি। জীবনে যা করে নি তাই করতে হল। প্যাকেটটা খুঁজে না পেয়ে শুধু চা খেয়ে আবার ছবি আঁকতে লাগল। ঘণ্টা খানেক বেলা থাকতে সে ফিরে আসতে আসতে চিন্তা করল, আগামী দিন বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে লক্ষ্য রাখলেই জানা যাবে, কোন জন্তু ওটা নিয়ে গেছে। তার দৃঢ় ধারণা হল, কোন হিংস্র জন্তু হবে না। হলে আমাকে ছেড়ে কথা বলত না।

পরের শুকবার নামাযের পর কায়সার সবকিছু নিয়ে সেই পাহাড়ে ছবি আঁকতে এল। আজও চা-বিস্কুট খেয়ে প্যাকেটটা ফ্লাস্কের পাশে রেখে ছবি আঁকতে শুরু করল। ছবি আঁকার দিকে মন থাকলেও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিস্কুটের প্যাকেটের দিকে লক্ষ্য রাখল। কিন্তু আজ তা ঘটল না। ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, কোন জন্তু হলে খাবার লোভে নিশ্চয়ই আসতো। আবার চিন্তা করল, জন্তুটা হয়তো পরপর দু-তিন দিন এসে, না পেয়ে আর আসে নি। ঘটনাটা ঘটল আরো দু সপ্তাহ পরে। সেদিন ঝর্নার ছবিটা কমপ্লিট করে ব্যাগের পাশে রেখে অন্য একটা ছবি আঁকছিল। চা খাবার সময় দেখল, বিস্কুটের প্যাকেটের সঙ্গে সেই ছবিটাও নেই। সেদিনের ঘটনার পর আর কোন কিছু না হতে, সে জিনিস পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার মনে করে নি। চিন্তা করল বন্য জন্তু বিস্কুট খাবার লোভে সেটা নিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু ছবিটা কি হল? আজ পাঁচ-ছয় সপ্তাহ ধরে ছবিটা আঁকলাম। সেটা না পেয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। ছবি আঁকতে আর কায়সারের ইচ্ছা হলো না। সময়ের আগে ফিরে এল। পরের সপ্তাহে আবার সে আগের ছবিটা আঁকতে শুরু করল। সেই সঙ্গে জিনিস-পত্রের দিকে নজর রাখতে ভুলল না। কায়সার কিছুক্ষণের জন্য ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। হঠাৎ নাকে আতরের গন্ধ লাগাতে তার হুঁশ হলো। ভাবল, নিশ্চয়ই কোন মানুষ আতর মেখে এখানে এসেছে। সে বুদ্ধি খাটিয়ে ছবি আঁকার অভিনয় করতে করতে বাঁকা চোখে জিনিস-পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখল। একটু পরে দেখতে পেল, ঘাগরা ও কামিজ পরা এবং

গায়ে ওড়না দেয়া এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী তার দিকে নজর রেখে ফ্লাক্সের কাছে গেল। তারপর বিস্কুটের প্যাকেটটা নিয়ে আবার পা টিপে টিপে ফিরে যাচ্ছে। মেয়েটাকে দেখে কায়সার ভুত দেখার মত চমকে উঠল। মেয়েটা হুবহু ডালিয়ার মত দেখতে। ভাল করে লক্ষ্য করে তার মনে হল, মেয়েটা যদি সালওয়ার কামিজ পরতো, তা হলে তাকে ডালিয়াই বলে ভুল করতাম। এই পোশাকে মেয়েটাকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে। চিন্তা করল, আমি স্বপ্ন দেখিছি না তো? দুহাতে চোখ রগড়ে তাকে দেখতে লাগল। মেয়েটা একটু দূরে চলে যেতে ডাকল, এই যে শুনুন। এর পরের ঘটনা পাঠকবর্গ প্রথম অধ্যায়ে পড়েছেন। এবার তার পরের ঘটনা পড়ুন।

চতুর্থ

জৈন্তাপুরের দেলওয়ার সর্দারের বাড়ী থেকে সালুটিকুরে ফিরে এসে কায়সার অফিসে এলে কংকর জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনি এই কয়দিন কোথায় ছিলেন? শনিবার অফিসে এসে আপনাকে না পেয়ে ভেবেছিলাম, হঠাৎ কোন কারণে দেশে গেছেন।

কায়সার ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বলল, এবার কোথাও গেলে তোমাকে বলে যাব। এই কয়দিনের কাজ সব পড়েছিল। কায়সার সে গুলো করতে লাগল। দিনে কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাত্রে সাবিহার জন্য তার মন খুব ছটফট করে। কবে ছুটির দিন আসবে, সেই প্রতীক্ষায় থাকে। দেখতে দেখতে ছুটির দিন এসে যায়। কায়সার দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে জুম্মার নামাজ পড়ে সেই পাহাড়ে এসে হাজির হল। সেই দিন থেকে চায়ের ফ্লাক্স, ব্যাগ ও ছবি আঁকার সরঞ্জাম সেখানে পড়ে আছে। আজ সে একটা নতুন ফ্ল্যাক্স কিনে তাতে চা ভরে কিছু কেক ও বিস্কুট নিয়ে এসেছে। পানির ছোট ক্যান সব সময় তার ব্যাগে থাকে। সেটা সেখানে ব্যাগেই আছে। পাহাড়ে পৌঁছে দেখল, সব কিছু ঠিকমত রয়েছে। চারপাশে একবার তাকিয়ে সাবিহাকে দেখতে না পেয়ে ছবি আঁকতে প্রস্তুতি নিল। কিন্তু ছবি আঁকবে কি? তখন তার মনে সাবিহার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। রং তুলি রেখে বসে চিন্তা করতে লাগল, সাবিহা এল না কেন? তার কোন অসুখ বিসুখ হয় নি তো? না সে ইচ্ছা করে এল না? এই কথা চিন্তা করে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

সাবিহা কিন্তু কায়সারের আগেই এসেছে। সে কায়সারকে আসতে দেখে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে এতক্ষণ তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। তাকে মন খারাপ করে বসে থাকতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে খুব আস্তে আস্তে কায়সারের পেছন দিক থেকে এসে দুহাত দিয়ে তার চোখ টিপে ধরে বলল, বাবুজী।

কায়সার চমকে উঠে তার হাত দুটো ধরে প্রথমে দুটা হাতেই চুমো খেল। তারপর

সামনে টেনে এনে বসিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইল।

সালামের জবাব দিয়ে সাবিহাও তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর লজ্জা পেয়ে বলল, এতক্ষণ ধরে কি দেখছেন?

ঃ আমার স্বপ্নের রানীকে।

আজ সাবিহা শালওয়ার কামিজ পরে ওড়না গায়ে দিয়ে এসেছে। তাই কায়সারের মনে হল সাবিহা যেন ডালিয়ার প্রতিচ্ছবি। খুব আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করল, একই রকমের দুজন হয় কি করে? পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে বুঝতে পারল, একই রকমের দেখতে হলেও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সব থেকে বেশি যেটা তার কাছে বুঝতে পারল, সেটা হল সাবিহার সলাজ হাসি।

সাবিহা তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, কি ভাবছেন? এবার হাতটা ছাড়ুন, ব্যথা করছে।

কায়সার যে তার হাত দুটো শক্ত করে ধরে রেখেছে সে কথা খেয়াল ছিল না, সাবিহার কথা শুনে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেখল, ফর্সা নিটোল হাত দুটোর ধরা জায়গায় রক্ত জমে লাল হয়ে গেছে। সেখানে চুমো খেয়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমাকে দেখে আমি বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এদিকে কোন খেয়াল ছিল না। মাফ করে দাও।

ঃ এতে মাফ চাওয়ার কি আছে? ব্যথার সঙ্গে আরো কিছু পেয়েছি।

ঃ সেটা কি?

ঃ আনন্দ।

ঃ তা হলে আলগা করে ধরতে পারি বলে কায়সার আবার তার হাত ধরতে গেল।

সাহিবা তড়িৎ গতিতে দাঁড়িয়ে বলল, না, আমার ভীষণ লজ্জা পায়।

ঃ দাঁড়ালে কেন বস চা খাওয়া যাক। তারপর কেক ও বিস্কুটের প্যাকেট বের করে বলল, আগে কেক খাও পরে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়া যাবে।

চা খাবার সময় সাবিহা বলল, আপনার নামটা বলবেন?

ঃ কায়সার।

ঃ বাবা সেদিন বলল, আপনি সালুটিকুরের পোস্ট মাস্টার। আপনার বাড়ি কোথায়?

ঃ ঢাকায়।

ঃ ঢাকার ঠিকানা বলুন।

ঃ বলা যাবে না।

ঃ কারণ?

ঃ কারণ আমি বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে তিন-চার মাস হল চাকরি নিয়ে এখানে চলে এসেছি।

ঃ কেন?

ঃ তাও এখন বলা যাবে না।

ঃ কবে বলা যাবে?

ঃ যেদিন আমি তোমাকে ..... বলে থেমে গেল।

ঃ কি হলো থেমে গেলেন কেন?

ঃ সেটাও এখন বলা যাবে না।

ঃ কেন বলা যাবে না কেন?

ঃ শুনলে তুমি মাইণ্ড করবে।

ঃ না করব না।

ঃ সত্যি বলছ?

ঃ সত্যি বলছি।

ঃ যে দিন তোমাকে আমি বিয়ে করব সেদিন বলব।

কথাটা শুনে সাবিহা ভীষণ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল। কায়সার একটু অপেক্ষা করে তার চিবুক তুলে ধরে বলল, বললাম না, কথাটা শুনে তুমি মাইণ্ড করবে।

সাবিহা বলল, আমি মাইণ্ড করি নি। ছেলেরা মনের কথা অকপটে বলতে পারলেও মেয়েরা লজ্জায় তা পারে না। আপনি যে কথা বললেন, তার আগ-পিছু চিন্তা করে বলেছেন? আপনি শহরের ছেলে। আপনাদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের কোন-মিল নেই। আপনার বাবা-মা যদি রাজি না হন। আমরা জানি শহরের ছেলেরা পাহাড়ী ললনাদের নিয়ে শুধু ফুর্তি করতে চায়। বিয়ের কথা শুনলে ঘৃণা করে দূরে সরে যায়। দৈবাৎ যদি কেউ আবেগের তাড়নায় বিয়েও করে, তখন তাদের সমাজ সেই বিয়ে মেনে নেয় না। শেষমেস বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

কায়সার বলল, তোমার কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সবাইকে সমান ভাবা উচিত না। তুমি আমাকে যদি সেই রকম মনে কর, তাহলে আর কখনো আমার কাছে এসো না। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে ভিজে গলায় বলল, তোমাকে আজ আসতে বলে অন্যায় করছি। সেজন্যে মাফ চাইছি। তারপর ব্যাগে সবকিছু ভরে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, তুমি শহরের ছেলেদের যতই ঘৃণা ও অবিশ্বাস কর না কেন, আমি আজীবন তোমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবো। ভাবব আল্লাহ্ পাক আমার কোন জোড়া পয়দা করেননি। কথা শেষ করে সে চলে যেতে লাগল।

সাবিহা ভাবতেই পারছে না, এই সামান্য কথায় বাবুজী মনে এত কষ্ট পাবে। প্রথমে সে কি করবে না করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে তার কার্যকলাপ অবাক হয়ে দেখছিল। তারপর তার কথা শুনে ও তাকে চলে যেতে দেখে আর বসে থাকতে পারল না। দাঁড়িয়ে ছুটে এসে কায়সারের পথরোধ করে ছলছল নয়নে তার মুখের দিকে শুধু

চেয়ে রইল। শত চেষ্টা করেও গলা থেকে শব্দ বের করতে পারল না।

সাবিহা সামনে দাঁড়াতে কায়সারও দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার চোখে পানি দেখে বলল, আমার কোন ব্যবহারে যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাক, তাহলে দয়া করে মাফ করে দিও।

সাবিহা কিছু বলার জন্য বারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সফল হচ্ছে না। তার চোখ দিয়ে শুধু পানি গড়িয়ে পড়ছে।

কায়সার বলল, কাঁদছ কেন? ক্ষমা করতে না পারলে, শহরের ছেলে মনে করে গালাগালি কর। ইচ্ছে করলে ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দাও। অথবা মাথায় পাথর মেরে শেষ করে দাও। তারপর তাকে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল।

সাবিহা আর সহ্য করতে পারল না, ছুটে তাকে ধরতে গেলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠে বলল, প্লীজ বাবুজী আমাকে ভুল বুঝে চলে যাবেন না। যদি যান, তাহলে আগামী দিন এসে আমার লাশ দেখবেন।

কায়সার সাবিহার আর্তনাদ ও কথা শুনে পিছনে ফিরে দেখে তাড়াতাড়ি এসে তাকে ধরে তুলে বসিয়ে বলল, ছি সাবিহা, এমন কথা বলতে নেই। খোদা না করুন, তোমার কিছু হলে আমিও বাঁচবো না।

সাবিহা কায়সারের বুকে মাথা রেখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, তাহলে আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছিলেন কেন?

কায়সার বলল, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। মাফ করে দাও।

সাবিহা তার মুখে চাপা দিয়ে বলল, আপনি বারবার আমার কাছে মাফ চাইবেন না, আমি কষ্ট পাই। আমাদের এখানে ঐরকম ঘটনা ঘটেছে বলে আমি কথায় কথায় বলে ফেলেছি। কথাটা শুনে আপনি মনে কষ্ট পাবেন জানলে বলতাম না। এবারের মত মাফ করে দিন।

কায়সার বলল, তোমার প্রেম আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমাকে এত ভালবাস তা বুঝতে পারি নি। দোওয়া করছি, আল্লাহ পাক যেন আমাদের প্রেম অমর করে দেন। সাবিহা আমিন বলে বলল, তিনি যেন আমাদের জোড়াও কবুল করেন। কায়সারও আমিন বলে তাকে সোজা করে বসিয়ে বলল, চল আবার একটু চা খাই।

চা খেয়ে গল্প করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল। কায়সার বলল, এবার ফেরা যাক চল, বেলা বেশি নেই। কিছুদূর একসঙ্গে এসে সামনের শুক্রবারে দেখা সাক্ষাতের ওয়াদা করে সাবিহাকে বিদায় দিয়ে তার চলে যাওয়ার দিকে কায়সার তাকিয়ে রইল। পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে সে নিজের পথ ধরল।

পরবর্তী শুক্রবারে এসে চা খাবার সময় কায়সার সাবিহাকে জিজ্ঞেস করল, পাহাড়ী রাস্তা ভেঙ্গে এতদূর আসতে তোমার কষ্ট হয় না?

ঃ না, ছোট বেলা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে।

ঃ তা না হয় বুঝলাম কিন্তু এতখানি নির্জন রাস্তায় আসতে তোমার ভয় করেনা।

ঃ এখানে হিংস্র প্রাণী নেই, ভয় করবে কেন?

ঃ কিন্তু হিংস্র ও লোভী মানুষ থাকতে পারে?

ঃ এই অঞ্চলে এমন কোন মানুষ নেই, যে আমার আমার গায়ে হাত দেবে।

ঃ কারণটা আব্বা সর্দার বলে, না নিজের শক্তির বলে?

ঃ দুটোই।

ঃ তবু তুমি সুন্দরী যুবতী নারী। তোমার কোন না কোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারে।

ঃ তা পারে। তবে তা সামাল দেবার মত ক্ষমতা আমার আছে।

ঃ একটু অবাক হয়ে, যতই ক্ষমতা থাক, প্রতিপক্ষের ক্ষমতা যদি বেশি হয়?

ঃ সে রকম লোক এখানে নেই।

ঃ বাইরের লোকও আসতে পারে?

ঃ এলেও আমাকে পাচ্ছে কোথায়?

ঃ ধর আমিই যদি কুমতলবে তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে খেলতে তোমার ইজ্জতের ওপর হামলা করি?

ঃ ওরকম বাজে কথা বলবেন না। আপনি ওসব করতে পারেন না।

ঃ শয়তান ঘাড়ে চাপলে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। আমিও তো মানুষ, শয়তান আমার ঘাড়ে চেপে বসতে পারে?

ঃ ঘাড় থেকে শয়তান নামাবার কৌশল আমার জানা আছে।

ঃ কৌশলটা আমি জানতে চাই।

ঃ আগে শয়তান ঘাড়ে চাপুক, তারপর জানবেন। ভার্সিটিতে পড়ার সময় কায়সার জুডো-ক্যারাত প্র্যাকটিস করত। এখানো প্রতিদিন করে। চিন্তা করল, সাবিহাও কি সেই রকম কিছু জানে না কি? না সর্দারের পাহাড়ী ললনা বলে অহংকার করছে। একটু পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়? বড় লোকের খেয়ালী ছেলে। যেই ভাবা সেই কাজ। হঠাৎ সাবিহার একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে তাকে শুইয়ে দিয়ে সালওয়ারের ফিতায় হাত দিয়ে খোলার অভিনয় করল।

সাবিহা প্রথমে মনে করছিল, বাবুজী তাকে হয়তো একটু আদর করবে। তাই বাধা দেয় নি। কিন্তু যখন সালওয়ারের ফিতায় কায়সার হাত দিল তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঠাস করে জোরে তার গালে একটা চড় মারল। তারপর, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আপনি এত ছোটলোক, ইতর, লুচ্চা ভাবতে পারছি না। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কায়সারকে উঠে তার দিকে

এগোতে দেখে কোমরের লুকানো খাপ থেকে ভজালি বের করে গর্জে উঠল, খবরদার আর এক পা এগোলে খুন করে ফেলবো।

দেলওয়ার সর্দার মেয়েকে কলেজে পড়তে দেওয়ার আগে শহরের সমাজের অবক্ষয় দেখে টাউন থেকে মেয়ে ট্রেনার আনিয়ে তিনমাস জুডো ক্যারাত শিখিয়েছেন।

কায়সার তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে ধরতে গেল।

সাবিহা ভজালি দিয়ে তাকে আঘাত করার জন্য আক্রমণ করল।

কায়সার তার ভজালি ধরা হাতটা ধরে মোচড় দিয়ে সেটা কেড়ে নিয়ে জঙ্গলে ছুঁড়ে দিল।

এই ফাঁকে সাবিহা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হিংস্র বাঘিনীর মত একের পর এক আক্রমণ করে চলল। কায়সারকে ভাল ছেলে মনে করে তাকে যতটা না ভালবেসেছিল তার ইতরামী দেখে এখন তার চেয়ে শতগুণ ঘৃণা করে তাকে খুন করে ফেলতে চাইল। তাই সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আক্রমণ চালাতে লাগল।

কায়সার অত্যন্ত সুকৌশলে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে সাবিহা শত চেষ্টা করেও দু-চারটে সাধারণ আঘাত ছাড়া মোক্ষম আঘাত করতে পারল না। শেষে সে যখন হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে আসতে লাগল তখন তার মনে ভয়ের সঞ্চার হল। ভাবল, বাবুজী তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং এই ব্যাপারে খুব ওস্তাদ। নচেৎ সব আক্রমণ ব্যর্থ করে দিচ্ছে কি করে? তাহলে আমি কি ইজ্জত বাঁচাতে পারবো না? আচ্ছা ছুটে পালালে কেমন হয়? আবার ভাবল ছুটে পালাতে পারবো কি? ধরে ফেলবে। এই সব চিন্তা করতে করতে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

কায়সার এতক্ষণ আক্রমণ না করে নিজেকে রক্ষা করছিল। এখন সুযোগ পেয়ে তাকে আক্রমণের অভিনয় করে তার হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রেখে বলল, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? সাবিহা হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা চালালে, কায়সার তার হাতের উপর চাপ বাড়াতে বাড়াতে বলল, বেশি বাড়াবাড়ি করলে হাত দুটো ভেঙ্গে দেব। তারপর ব্যাগের কাছে নিয়ে এসে রশি দিয়ে তার হাত দুটো বেঁধে যখন পা বাঁধতে গেল তখন সাবিহা তাকে ধাক্কা দিয়ে নিজে পিছনের দিকে সরে এসে ফ্লাইং কিক চালাল। ধাক্কা খেয়ে কায়সার সাবধান হয়ে গিয়েছিল। সাবিহার ফ্লাইং কিক খেয়ে পড়ে যাবার সময় তার পা ধরে ফেলল। ফলে সাবিহা তার উপর এসে পড়ল। কিকটা বেশ জোরে আঘাত করলেও কায়সার পাত্তা না দিয়ে উঠে সাবিহার পা দুটো একজায়গায় করে বেঁধে ফেলল। তারপর জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, এতক্ষণ তো তুমি অনেক খেলা দেখালে, যা আমি হজম করলাম। এবার আমার পালা। আমিও তাহলে কিছু খেলা খেলি, দেখ, কতটা হজম করতে পার। চিৎকার করলেও এই

নির্জন জায়গায় কেউ শুনবে না। তুমি আমাকে যে সব কথা বলে গালাগালি করলে, আমি সেই সব খেলা এবার খেলব।

রাগে সাবিহার চোখ থেকে পানি বেরিয়ে এল। হুংকার দিয়ে বলল, আপনি না মুসলমান? আপনি না নামায পড়েন? আমার কোন ক্ষতি করলে আপনার উপর আল্লাহ্‌র গজব পড়বে।

কায়সার মৃদু হেসে বলল, গজব যখন পড়বে তখন দেখা যাবে। তার আগে মনের কামনা-বাসনা পূরণ করে নিই।

সাবিহা কোন উপায় না দেখে আসমানের দিকে চেয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, "আল্লাহ তুমি সর্বশক্তিমান, তোমার সমকক্ষ ত্রিভুবনে কেউ নেই। তুমি এই জালিমের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

কায়সার ক্যানের মুখে পানি ঢেলে খেয়ে সাবিহার কাছে এসে তার মুখের কাছে পানির পাত্র ধরে বলল, আল্লাহ তোমার ফরিয়াদ কবুল করে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে পানি দিয়ে পাঠিয়েছেন। অনেকক্ষণ মারামারি করেছ, নিশ্চয় আমার মত তোমারও পিয়াস লেগেছে। আগে পানি খেয়ে নাও, তারপর বাঁধন খুলে দিচ্ছি।

কায়সারের কথা ও হাবভাব দেখে সাবিহার সন্দেহ হল। ভাবল, আমি কি ভুল করলাম।

সাবিহাকে তার দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কায়সার একহাতে মাথা ধরে অন্য হাতে পানির পাত্রটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল, কই নাও, পানিটা খেয়ে নাও।

তবু যখন সাবিহা পানি না খেয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তখন কায়সার তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে বলল, আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা হয়, তাহলে খুলে দিচ্ছি, নিজের হাতে খাও।

কায়সারের প্রাথমিক কার্যকলাপে সাবিহা দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে এত কিছু কাণ্ড করল। সে যে তার সঙ্গে অভিনয় করছে তা বোঝবার চেষ্টা করেনি। এখন তার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে বুঝতে পারল, কায়সারের চোখে মুখে কুমতলব বা রাগের চিহ্ন নেই। তা হলে সে কি আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে এতক্ষণ অভিনয় করছিল?

সাবিহা যে গালে চড় মেরেছিল, সেই গালটা ব্যথায় টনটন করছে। কায়সার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে সেই গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আগের ব্যথা সারে নি, তার উপর তুমি মেরে আরো বাড়িয়ে দিলে। আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?

সাবিহা এবার ব্যাপারটা চিন্তা করে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাগের বদলে অনুশোচনার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে তখন কায়সারের দু পা জড়িয়ে ঝর ঝর করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আপনার সঙ্গে ভীষণ দুর্ব্যবহার করে ফেললাম, আমাকে মাফ করে দিন।

কায়সার আরে এ কি করছ বলে পা থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার চোখের পানি মুছে দেবার সময় বলল, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। আমি তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবে তোমার কথার সত্যতা যাঁচাই করলাম। আক্রমণ করার ও আক্রমণ প্রতিহত করার সব কৌশল আয়ত্ত করতে শেখনি। যার কাছে শিখেছ, উনি হয়তো তত দক্ষ নন। নচেৎ তুমি পুরো কোর্স শেষ করনি। তবু যতটা শিখেছ তাতে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

সাবিহা কায়সারের মনোভাব জানতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

কায়সার তাকে কেঁদে হালকা হবার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিল। তারপর বলল, এমনিতে দুজনে নির্জনে মেলামেশা করে গোনাহ করছি। তার উপর তুমি যা করছ তাতে করে আমরা দুজনে আরো খুব শক্ত গোনাহর কাজ করে ফেলছি।

তার কথা শুনে সাবিহা কান্না থামিয়ে বলল, আগে বলুন, মাফ করে দিয়েছেন?

কায়সার বলল, দোষ আগে আমি করছি। তুমি মাফ চাইছ কেন? মাফ চাইতে হলে আমারই চাওয়া উচিত। তুমি বরং আমাকে মাফ করে দাও।

সাবিহা আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে কায়সারের আঘাত পাওয়া গালে নিজের গাল ঠেকিয়ে বলল, আপনাকে বুঝতে না পেরে যে কত বড় গুরুতর অন্যায় করে ফেললাম, সে কথা ভেবে শরমে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। এভাবে আপনি অগ্নি পরীক্ষা করবেন তা ভাবতেও পারছিনা। আপনাকে আমি একটা সাধারণ ছেলে মনে করছিলাম। এখন বুঝতে পারলাম, আপনি তা নন। আপনার আসল পরিচয় বলবেন?

ঃ আসল পরিচয় জানতে হলে তোমাকে আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। তাও আবার আমার সঙ্গে। তারপর দুষ্টুমি করে বলল, এবার সরে বস বলছি, নচেৎ সত্যি সত্যি ইতরামী করে ফেলব।

সাবিহা তার দুষ্টুমি বুঝতে পেরে সরে বসে মেকি রাগ দেখিয়ে বলল, মরদের মুরোদ একটু আগেই তো দেখতে পেলাম, বাঁধা অবস্থায় যিনি কিছু করতে পারলেন না, খোলা অবস্থায় তিনি আর কি ইতরামি করবেন?

কায়সার হেসে উঠে বলল, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় যেদিন তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাব, সেদিন ইতরামি করে আজকের শোধ তুলব।

সাবিহা লজ্জা পেয়ে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, এসব কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আপনার পায়ে ধরে মাফ চাই। আর কোন দিন এমন ভুল করবো না বলে সে আবার কায়সারের পায়ে হাত দিতে গেল।

কায়সার তার হাত দুটো খপ করে ধরে দুটো হাতেই চুমো খেয়ে বলল, আবার পায়ে হাত দিচ্ছ ? গুরুজন ছাড়া আর কারো পায়ে হাত দেওয়া উচিত নয়।

ঃ আপনি আমার কাছে সব থেকে বড় গুরুজন।

ঃ এখনো তা হই নি।

ঃ না হলেও আমি মনে প্রাণে আপনাকে তাই মনে করি।

ঃ মনে করলে সব কিছু হয় না। তার আগে আইনের মাধ্যমে বন্ধন করে নিতে হয়।

ঃ সে ব্যবস্থা আপনি যখনই করতে চাইবেন তখনই আমি প্রস্তুত।

ঃ যদি বলি আজ আর তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে না দিয়ে টাউনে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব?

ঃ তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।

ঃ তোমার আব্বা জানতে পেরে আমাকে মেয়ে কিডন্যাপ করার কেস করে জেলে পাঠাতে পারেন। তার চেয়ে এক কাজ করি, এখন তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার আব্বাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। রাজী থাকলে বলব, এক্ষুণি সেই ব্যবস্থা করুন।

সাবিহা হেসে উঠে বলল, আবার দুষ্টুমি করছেন? আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হবে। তবে আমার মনে হয়, আপনি প্রস্তাব দিলে বাবা মেনে নেবে না।

ঃ কেন?

ঃ কেন আবার। বাবা আপনাকে একজন সামান্য পোস্ট মাস্টার বলে জানে। একটা গোত্রের ধনী দলপতি কি আর তার মেয়েকে বিয়ে যার তার সঙ্গে দেবে? তাছাড়া শহরের বাবুদেরকে আমাদের গোত্রের লোকেরা বিশ্বাস করে না।

কায়সার আবার দুষ্টুমি করার জন্য মুখ চুন করে বলল, তাহলে তোমাকে বিয়ে করার আশা দুরাশা মাত্র। আমার আব্বা তো তোমার আব্বার মত প্রতিপত্তিশালী নয়। আর অত ধনীও নয়। তাহলে এখন থেকে আর আমাদের মেলামেশা না করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নচেৎ শেষে আবার দুজনের দুঃখের সীমা থাকবে না। কথা শেষ করে কায়সার উঠে জিনিস-পত্র ব্যাগে ভরে বলল, জীবনে তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না, তাই শেষ বারের মত বলছি, এই কয়দিনে তোমার কাছে যা কিছু অন্যায় করেছি মাফ করে দিও। আসি আল্লাহ হাফেজ বলে সে হাঁটতে আরম্ভ করল।

সাবিহা তার কাজ ও কথা শুনে মনে করছিল, সে আবার অভিনয় করছে। কিন্তু তাকে সত্যি সত্যি চলে যেতে দেখে ছুটে গিয়ে পথ আগলে অশ্রুসজল চোখে বলল, সত্যি তা হলে আপনি সাবিহার লাশ দেখতে চান?

কায়সার চমকে উঠে সাবিহার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে বলল, কেউ লাশ দেখলে কায়সার ও সাবিহার লাশ একসঙ্গে দেখবে।

সাবিহা তার পিঠে কয়েকটা আদরের কিল দিয়ে বলল, আমাকে বারবার কাঁদিয়ে বুঝি আপনি খুব আনন্দ পান?

ঃ ঠিক তা নয়, কেন কাঁদাই শুনবে?

ঃ বলুন।

ঃ লোকে বলে আগে দুঃখ পরে সুখ ভাল। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তাই আমি পাহাড়

থেকে পড়ে দুঃখ পেলাম। শেষে তোমাকে পেয়ে সেই দুঃখের চেয়ে হাজারগুণ বেশি সুখ পেলাম। সেই কারণে আমিও তোমাকে প্রথমে দুঃখ দিয়ে বার বার কাঁদাচ্ছি। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বিয়ের পর নিশ্চয় তুমি সুখী হবে।

সাবিহা চোখের পানি মুছে বলল, আপনি এমনভাবে অভিনয় করেন, যেন সত্যি সত্যি করছেন। আমি যে আপনাকে ভুল বুঝে ফেলছি।

কায়সার বলল, তোমার জ্ঞান এখনো পরিপক্ক হয় নি। তাই ভুল করছ। ছেলেবেলা থেকে আমি বড় দুষ্টু। আমার একটা বোন আছে সে কলেজে পড়ে। এখনো তাকে দুষ্টুমি করে কাঁদাই এবং মাঝে মাঝে মারধোরও করি।

ঃ আপনার বাবা-মা কিছু বলেন না?

ঃ বললে আরো বিপদ। আমার মতের বাইরে কিছু বললে বা করলে আমি যে হাওয়া হয়ে যাব, সে কথা জেনে কিছু বলতে পারে না।

ঃ হাওয়া হয়ে যাবেন মানে?

কায়সার হেসে উঠে বলল, হাওয়া কথাটা বুঝলে না? এই যে কয়েক মাস আগে আমাকে না জানিয়ে তারা আমার বিয়ে দেবার জন্য তোমার মত একটা সুন্দরী, বিদ্যাবতী মেয়ে ঠিক করেছিল। আমি জানতে পেরে আজ কমাস হাওয়া হয়ে গেছি। সাবিহাও হেসে উঠে বলল, তাহলে বিয়ের ভয়ে এখানে পালিয়ে এসেছ। কিন্তু বাহাদুর সাহেব চাকরিটা বাগালেন কি করে?

ঃ ভাগ্য ভাল ছিল, একটু জোরে সোরে তদবীর করতে হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

সাবিহার মনে হল, বাবুজী হয়তো ধনীর দুলাল। জিজ্ঞেস করল, আপনার বাবা-মা খোঁজাখুঁজি করেন নি?

ঃ করেন নি আবার, তবে তারা ভাবতেই পারেনি এই পাহাড়-জঙ্গলে এসে আমি চাকরি করছি। তাই এদিকে খোঁজ নেবার দরকার মনে করে নি।

তারা এতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। এবার দুজনের রাস্তা দু দিকে। কায়সার বলল, আজ কাহিনী এই পর্যন্ত মুলতবী রইল। আল্লাহ পাক রাজী থাকলে পরবর্তী অধ্যায় আগামী শুক্রবারে শুরু করবো। তারপর রিস্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে বলল, বেলা বেশি নেই। আমি এই বিলের পানিতে অজু করে আসরের নামায পড়বো। তুমি এবার যাও। তা না হলে একটু দাঁড়াও নামায পড়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

এতদিন তো একাই যাতায়াত করছি। তবে আপনি যদি যান তাহলে বাবা-মা খুব খুশী হবে।

ঃ তুমি হবে না?

ঃ তা কি আপনি জানেন না?

ঃ জানি। তবু তোমার মুখে শুনতে চাই।

ঃ গেলে কতটা হব তা অর্ন্তযামী জানেন। তবে আজ আর আসতে দেব না।

ঃ একটু অপেক্ষা কর, নামাযটা পড়ে নিই।

নামায পড়ে কায়সার সাবিহাকে পাহাড়ী রাস্তা পার করে তাদের গ্রামের সীমানায় পৌঁছে বলল, এবার তুমি যাও। আমি অন্য একদিন যাব। এবার একটা কথা বলি?

ঃ বলুন।

ঃ আমাকে আর বাবুজী বলে না ডেকে নাম ধরে ডাকবে। আর আপনি নয় তুমি।

ঃ আল্লাহ্ পাক যখন রাজী হবেন তখন বলব।

ঠিক আছে তাই বলো বলে কায়সার সালাম জানিয়ে বলল, আসি আল্লাহ হাফেজ।

সাবিহা সালামের উত্তর দিয়ে সে ও আল্লাহ হাফেজ বলে তার চলে যাবার দিকে চেয়ে রইল। পাহাড়ের আড়াল হয়ে যেতে সেও নিজের পথ ধরল।

পঞ্চম

কায়সার বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে আসার পর শামসুল আলম সাহেব অনেক খোঁজাখুজি করলেন। বেশ কিছুদিন বাংলা ও ইংরেজী খবরের কাগজে ছেলেকে ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিলেন। আকলিমা বেগম ছেলের জন্য কেঁদে বিছানা নিলেন। হিমুও ভাইয়ার জন্য আব্বাকে দোষারূপ করে কান্নাকাটি করল। শামসুল আলম সাহেব প্রথম দিকে ছেলের উপর রেগে গিয়েছিলেন। পরে তার ভাল-মন্দ চিন্তা করে খুব চিন্তিত হলেন।

কায়সারের চলে যাবার কথা শুনে ম্যানেজার জাব্বার সাহেবের বাসাতেও বিষাদের ছায়া নেমে এল।

ঐদিন কায়সারের বাসায় তাকে দেখে এবং তার সাথে আলাপ করে ডালিয়ার খুব পছন্দ হয়েছিল। সে কথা জেনে তার বাবা-মা শামসুল আলমকে জানাবার পর তিনি বিয়ের ব্যবস্থা করেন। একদিন ডালিয়া কলেজে হিমুকে জিজ্ঞেস করল, তুই সত্যি করে বল দেখি, আমার সাথে বিয়ে ঠিক হতে তোর ভাইয়া বাসা থেকে পালিয়ে গেল কেন? তাহলে তোর ভাইয়া কি আমাকে পছন্দ করে না?

হিমু বলল, তোর অনুমান পুরোটা ঠিক নয়। তুই তো অপছন্দ করার মত মেয়ে না। আমার কি মনে হয় জানিস, ভাইয়া এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে রাজী নয়। আর একটা কারণ হতে পারে, ভাইয়াকে জিজ্ঞেস না করে বিয়ের ব্যবস্থা করাতে সে রাগ করে চলে গেছে। আমার যতদূর মনে হয়, তোর জন্য ভাইয়া যায় নি।

কায়সারের সঙ্গে ডালিয়ার একবার মাত্র পরিচয় হয়েছিল। তাতেই সে বুঝতে পেরেছিল, আজকালের বড়লোকের ছেলেদের মত সে উচ্ছৃঙ্খল নয়, বরং ধার্মিক। তার বোন হিমুকেও তাই দেখেছে। তারপর থেকে ডালিয়া যেমন মনে মনে কায়সাকে

ভালবাসতে শুরু করল তেমনি ধর্মের নিয়ম-কানুন জানবার সাথে সাথে সেই সব অনুশীলনও করতে লাগল।

যতদিন যেতে লাগল আকলিমা বেগম ছেলের শোক ক্রমশ সহ্য করে নিচ্ছেন। মাঝে মাঝে হিমুর সঙ্গে ডালিয়া এলে তাকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে প্রবোধ দিতে গিয়ে নিজে আরো ভেঙ্গে পড়েন। ডালিয়া তখন উনাকে প্রবোধ দিয়ে বলে, আপনি ধৈর্য দরুন খালা আম্মা, কায়সার ভাই নিশ্চয় একদিন ফিরে আসবেন। এভাবে দিন ও মাস গড়িয়ে চলল।

এদিকে পরের সপ্তাহে কায়সার ছবি আঁকতে এসে সাবিহাকে না দেখে ভাবল, এক্ষুনী হয়তো এসে পড়বে। কিছুক্ষণ ঝর্নার দৃশ্য অবলোকন করে ঝর্নার ছবির স্কেচ তৈরী করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর বাবুজী ডাক শুনে ঘুরে একটা তের-চৌদ্দ বছরের পাহাড়ী ছেলেকে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

ঃ ছেলেটি বলল, হামার নাম রবিউল আছে।

ঃ এখানে কেন এসেছ?

ঃ বুয়া নে ভেজা।

কায়সারের মনটা ধক করে উঠল। তা হলে কি সাবিহা পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস করল, কে তোমার বুয়া?

ঃ সর্দারজী কা ম্যাইয়া বাবুজী। সর্দারজী কা তাবিয়ৎ বহুৎ খারাপ হ্যায়। ইস খবর আপনাকে দেনে কে লিয়ে বুয়া হামকো ভেজা।

কায়সার রং তুলি গুছিয়ে রেখে রবিউলকে নিয়ে চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল, তোমার বুয়া ভাল আছে?

ঃ জ্বী বাবুজী। লেকিন সর্দারজী বুখারমে বেহুশ আছে। ছোটা সর্দার ভি ঘরে নাই।

ঃ সর্দারজী কা লড়কা আদিল ভাই। উহ কারবার কা বারে মে ম্যানেজার কা সাথ ঢাকা গিয়া।

কায়সার চা খাওয়া শেষ করে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বলল, তুমি যাও। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।

রবিউলকে বিদায় দিয়ে কায়সার দ্রুত হেঁটে বাসায় ফিরে ব্যাগ রেখে ব্রীফকেস থেকে কিছু টাকা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। এখানে কোন ডাক্তার নেই। একজন মাত্র এম. বি. বি. এস. আছে। বেবী রিজার্ভ করে কায়সার সেই ডাক্তারকে নিয়ে রওয়ানা দিল।

সাবিহা রবিউলের মুখে বাবুজী ডাক্তার নিয়ে আসছে শুনে আনন্দে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সন্ধ্যে হয়ে যেতেও যখন এল না তখন ভাবল, হয়তো ডাক্তার এতদূর আসতে চায় নি। সে মাগরিবের নামায পড়ে বাবার মাথায় জলপট্টি দিতে

লাগল। বেবীর শব্দ পেয়ে বাইরে এসে বাবুজীকে ডাক্তারসহ উঠে আসতে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

কায়সার সাবিহাকে দেখতে পেয়ে সালাম বিনিময় করে বলল, তোমার বাবার কাছে নিয়ে চল।

সাবিহা তাদেরকে বাবার রুমে নিয়ে এল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, জ্বর একশো সাড়ে চার। জলপট্টিতে কাজ হবে না। মাথায় বরফ দিতে হবে। আপাতত পানি ঢালার ব্যবস্থা করুন। মাথায় পানি না দিয়ে খুব ভুল করছেন। আচ্ছা উনার জ্বর কবে থেকে হয়েছে?

সাবিহা বলল, পাঁচ ছয় দিন হল। গতকাল থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে। ডাক্তার বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন। তারপর প্রেসক্রিপসান করে দিয়ে বললেন, এই ওষুধ গুলো এক্ষুণী আনিয়ে খাওয়ান।

কায়সার ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে বেবীতে অপেক্ষা করতে বলে ফিরে এল।

সাবিহা তার দিকে ছল ছল নয়নে তাকিয়ে বলল, ভাইয়া বাড়িতে নেই। এখানকার লোকেরা এই রাত্রি বেলা ওষুধ কিনে আনবেই বা কি করে?

কায়সার জানে ওদের গাড়ী আছে। বলল, তোমাদের তো গাড়ী রয়েছে। আমি তোমার বাবাকে এক্ষুনী সিলেট হাসপাতালে নিয়ে যাব। তুমি চিন্তা করো না। আমি ডাক্তারকে বিদায় করে দিয়ে আসি। তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে তৈরী হয়ে নাও।

সাবিহা বলল, মা একটু অপেক্ষা করতে বলেছে।

একটু আগে সাবিহা মাকে ডাক্তারের ফিস ও ওষুধ কেনার জন্যে টাকার কথা বলতে নাদিরা পাশে নিজের রুমে গিয়েছিলেন ফিরে এসে মেয়ের হাতে এক হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল দিলেন।

সাবিহা সেটা কায়সারের দিকে বাড়িয়ে বলল, ডাক্তারের ফিস ও গাড়ী ভাড়া এখান থেকে দিন। আপাতত এটা রাখুন, আরো লাগলে পরে দেয়া হবে।

কায়সার টাকাটা না নিয়ে বলল, এভাবে আমাকে অপমান করতে পারলে? আমার কাছে টাকা আছে। ওটা রেখে দাও।

সাবিহা কিছু বলার আগে তার মা নাদিরা এগিয়ে এসে বললেন, আপনে রুপিয়া কাহে নেহি নেবেন বাবুজী। সর্দারজীর বিমারী সে যিতনা রুপিয়া লাগে হাম আপকো দেগা। আপনে ডাকটার লে আকর বহুৎ ভালা কিয়া। উনকো হাসপাতাল লে জানে কোভি খরচা দরকার হোগা। তারপর টাকাটা মেয়ের হাত থেকে নিয়ে কায়সারের হাতে দিলেন।

কায়সার টাকা নিয়ে এসে বেবী ও ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল। সেই রাতেই

কায়সার তাদের গাড়ীতে করে দেলওয়ার সর্দারকে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দিল।

নাদিরা মেয়েকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে হাসপাতালে এলেন। কায়সার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পরের দিন সকাল দশটায় সালুটিকুরে ফিরে এল। সাবিহার অনুরোধে সে গাড়ী নিয়ে এসেছে। অফিসের কাজ সেরে কংকরকে সব কথা বলে একটু আগে অফিস থেকে বেরিয়ে বেলা চারটের সময় হাসপাতালে এল। এভাবে সাবিহাদের গাড়ী নিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে লাগল। হাসপাতালে ভর্তি করার তিন দিন পর দেলওয়ার সর্দারের জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও ফিরল।

আরো তিন দিন পর আদিল ও হাবিব ঢাকা থেকে ফিরে সব কিছু শুনে বিকেলে হাসপাতালে যখন পৌঁছাল তখনও কায়সার আসে নি। বাবার মুখে কায়সারের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, বাবু তোমার জন্য এতকিছু করছে কেন?

দেলওয়ার সর্দার বললেন, বাবু বেড়াতে গিয়ে একরোজ পাহাড় সে গীরকে বেহুশ হয়ে পড়েছিল। আমি খবর পেয়ে ঘরমে লে কর ভাল করি। তাই হয়তো আমার বিমারের খবর পেয়ে করছে। বাবু বহুৎ আচ্ছা লাড়কা। হর রোজ আসে। আজ ভি আসবে। উসকা সাথে বাতচিত করলে বুঝতে পারবি। হাবিব এতক্ষণ সাবিহাকে চোরা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। একবার তার সঙ্গে চোখাচোখিও হয়েছে।

সাবিহা হাবিবকে ঐভাবে তার দিকে চাইতে দেখে বুঝতে পারল, ভাইয়ার ম্যানেজারের চোখে লোলুপতা রয়েছে। একবার চোখাচোখি হবার পর আর তার দিকে তাকাই নি। তখন তার কায়সারের কথা মনে পড়ল। কই সে তো ঐভাবে আমার দিকে তাকায় না। তার চাহনির মধ্যে যেন কত শান্তি আর বিশ্বাসের ইঙ্গিত।

পাঁচটার সময় কায়সার এলে দেলওয়ার সর্দার তার সঙ্গে আদিল ও হাবিবের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আদিল কায়সারকে বলল, আপনি বাবার জন্য যা কিছু করছেন, সে সব শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। সে জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কায়সার বলল, কি যে বলেন। মানুষ হয়ে যদি আমরা একে অপরের বিপদে সাহায্য না করি। তাহলে মনুষত্ব রইল কোথায়? আপনার বাবাও আমাকে একরকম পুর্নজন্ম দিয়েছেন। উনি সেদিন আমাকে উদ্ধার না করলে এতদিন বন্য প্রাণীর পেটে হজম হয়ে যেতাম। তারপর গাড়ির চাবিটা তার হাতে দিয়ে বলল, গাড়ী হাসপাতালের গেটে আছে।

কায়সারের সঙ্গে আলাপ করে আদিলের বেশ ভাল লাগল। কিন্তু হাবিব কায়সারকে ভাল চোখে দেখল না। সে লক্ষ্য করল, কায়সারকে দেখে সাবিহার চোখে মুখে আনন্দের দিপ্তি ফুটে উঠেছে। তারা বারবার দুজন দুজনের দিকে চাইছে। কায়সারকে

সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করল।

আরো এক সপ্তাহ পর দেলওয়ার সর্দার সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেন।

এই কদিন অফিসের খুব কাজের চাপ থাকায় কায়সার হাসপাতালে যেতে পারে নি। সময় করে একদিন হাসপাতালে গিয়ে শুনল, দেলওয়ার সর্দার বাড়ি ফিরে গেছে। ফেরার পথে কায়সার চিন্তা করল, খোঁজ নেবার জন্য জৈন্তাপুরে তার বাড়িতে যাবে কিনা। সর্দারের ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়ে কায়সারের ভাল লাগলেও তার ম্যানেজারকে ভাল লাগে নি। ছেলেটা যেন কেমন করে ক্রুর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। শেষ-মেস ভেবে ঠিক করল, সামনের শুক্রবার ছবি আঁকতে ঐ পাড়ে যাবে। ঐদিন সাবিহা নিশ্চয় দেখা করতে আসবে।

এদিকে কায়সার হাসপাতালে না আসাতে সাবিহা ভাবল, বাবুজীর কি তাহলে কোন অসুখ বিসুখ হল? কথাটা চিন্তা করে বাড়িতে আসার দুদিন পর একটা চিঠি রবিউলের হাতে দিয়ে বলল, সালুটিকুর পোস্ট অফিসে গিয়ে বাবুজীকে এটা দিয়ে বলবে, আমি উত্তর চেয়েছি।

রবিউল যথাসময়ে সালুটিকুর পোস্ট অফিসে এসে কায়সারকে চিঠিটা দেবার সময় সাবিহা যা বলতে বলেছিল তা বলল।

কায়সার রবিউলকে চিন্তে পেরে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি উত্তর লিখে দিচ্ছি। তারপর সে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল, বাবুজী, পত্রে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম ও ভালবাসা নেবেন। আজ দুদিন হল বাবাকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরেছি। এই কদিন আপনি আসলেন না কেন? কোন অসুখ বিসুখ হল কি-না জানার জন্য রবিউলকে পাঠালাম। আল্লাহ পাককে জানিয়েছি, রবিইল যেন আপনার শুভ সংবাদ দেয়। দুকলম লিখে ওর হাতে উত্তর দিবেন। আশাকরি পত্রে নিশ্চয় জানাবেন, কবে এবং কোথায় আপনার সাথে দেখা হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি—

আপনার সাবিহা।

চিঠি পড়া শেষ করে তাড়াতাড়ি দুকলম লিখে রবিউলকে চা-বিস্কুট খাইয়ে বিদায় দিল।

রবিউলকে পাঠিয়ে সাবিহা ঘর থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ে বসে তার ফেরার অপেক্ষা করছে। দূর থেকে তাকে আসতে দেখে ছুটে এসে রবিউলকে জিজ্ঞেস করল, কি রে বাবুজীর সাথে তোর দেখা হয়েছিল?

রবিউল হয়েছে বলে চিঠিটা তার হাতে দিল।

সাবিহা তাকে চলে যেতে বলে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল, সাবিহা আমার আন্তরিক

দোয়া ও অশেষ ধন্যবাদ নিও। আল্লাহ পাকের রহমতে আমি ভাল আছি। অফিসের কাজের চাপে তোমার বাবাকে দেখতে ঐ কদিন যেতে পারি নাই। তোমার বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে শুনে খুব খুশী হয়েছি। ইনশা আল্লাহ আগামী শুক্রবার ঐ পাহাড়ে ছবি আঁকতে যাব। গিয়ে নিশ্চয় তোমাকে দেখতে পাব। তোমার সার্বিক কুশল কামনা করে শেষ করছি, আল্লাহ হাফেজ। ইতি –

চিঠিটা পড়া শেষ করে গুলি পাকিয়ে জঙ্গলের দিকে ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে এল।

হাবিব বৈঠকখানার পাশে অফিস রুম থেকে সাবিহাকে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখে এতক্ষণ তাকে লক্ষ্য রাখছিল। রবিউলের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে পড়ার পর সাবিহাকে গুলি পাকিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিতে দেখেছে। সাবিহা চলে যেতে সে সেখানে গিয়ে খোঁজা-খুঁজি করে চিঠিটা পেয়ে পড়ে যা সন্দেহ করেছিল তার প্রমাণ পেয়ে কায়সারের ওপর ভীষণ রেগে গেল। চিঠিটা পকেটে রেখে ফেরার পথে চিন্তা করল, ঐ দিন সাবিহা কোন পাহাড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে এবং সেখানে তারা কি করে দেখতে হবে। তারপর যা করার ভেবে চিন্তে করা যাবে।

শুক্রবার বিকেলে তিনটের সময় কায়সার এসে সাবিহাকে দেখতে না পেয়ে ছবি আঁকতে শুরু করল। কিন্তু ছবি আঁকায় তার মন বসল না। কেবলই মনের মধ্যে সাবিহার কথা ভেসে উঠতে লাগল। তাকে আজ নয়দিন দেখেনি। মনে হল সাবিহাকে সে যেন কত কাল দেখেনি। ছবি আঁকা বন্ধ করে সে ঝর্নার দিকে চেয়ে আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টির কথা চিন্তা করছিল। বাবুজী ডাক শুনে চমকে উঠে ঘুরে সাবিহাকে দেখে সালাম দিয়ে বলল, কখন এলে? আসতে দেরী করলে কেন?

সাবিহা সালামের প্রতি উত্তর দিয়ে বলল, এক্ষুণী এলাম। বাবার সঙ্গে বি. এ.-তে এ্যাডমিশান নেবার ব্যাপারে কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। কেমন আছেন?

ঃ আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছি।

ঃ তোমার বাবা এখন কেমন আছেন?

ঃ ভাল।

ঃ এস একটু চা খাই।

ঃ আজ একটা সুখবর শোনাব।

ঃ তাড়াতাড়ি শোনাও।

ঃ আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমি ফার্স্ট ডিভিসানে পাস করেছি।

কায়সার আল হামদু লিল্লা বলে সাবিহার ডান হাত ধরে চুমো খেয়ে বলল, আল্লাহ পাক আমার মনের বাসনা পূরণ করেছেন জেনে তাঁর পাক দরবারে শত শত শুকরিয়া জানাচ্ছি। এখন তোমাকে আমার মিষ্টি খাওয়ান উচিত। তা পারলাম না বলে দুঃখিত। আগামী সপ্তাহে ইনশাআল্লাহ খাওয়াব।

সাবিহা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাবুজীর চুমো খাওয়া জায়গাটা চুমো খেয়ে নিজের দুগালে ঠেকাল তারপর বাঁ হাতে লুকিয়ে রাখা সন্দেশের প্যাকেট বের করে তাকে এক পিস খাইয়ে দিল। কায়সারও তার হাত থেকে এক পিস নিয়ে সাবিহাকে খাইয়ে দিল।

চা খেতে খেতে সাবিহা বলল, ছেলেদের মন বড় শক্ত

কায়সার বলল, সৃষ্টিকর্তা ছেলেদেরকে সেইভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ তাদেরকে অনেক শক্ত কাজ করতে হয়।

ঃ আপনার সঙ্গে যুক্তিতে পারব না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

ঃ কর।

ঃ আপনি কতদিন বাড়ি থেকে এসেছেন?

ঃ তা পাঁচ-ছ মাস হবে।

ঃ বাড়িতে চিঠি-পত্র দেন?

ঃ না।

ঃ কারণ?

ঃ কারণ সেদিন বললাম না, আব্বা-আম্মা বিয়ে দিতে চাচ্ছিল বলে হাওয়া হয়ে গেছি।

সাবিহা মৃদু হেসে বলল, কতদিন হাওয়া হয়ে থাকবেন?

ঃ যতদিন থাকা যায়।

ঃ যত দিনটা কত দিন আমি জানতে চাই।

ঃ সেটা আল্লাহ পাককে মালুম। আমি বলতে পারব না।

ঃ বাড়ির সবার জন্য মন কেমন করে না?

ঃ করে।

ঃ তাহলে যোগাযোগ করেন না কেন?

ঃ আল্লাহ পাক যখন রাজি হবেন তখন করবো। এবার আমি কিছু জিজ্ঞেস করি?

ঃ করুন।

ঃ তুমি এই প্রশ্নগুলো করলে কেন?

ঃ প্রশ্নগুলো হঠাৎ মনে এল তাই করলাম। আচ্ছা আপনি তো কোরান-হাদিসের অনেক জ্ঞান রাখেন?

ঃ অনেক না রাখলেও কিছু রাখি।

ঃ তা হলে বাবা-মার সঙ্গে এরকম করা কি উচিত হচ্ছে?

ঃ না, হচ্ছে না।

ঃ জেনেও তবু কেন করছেন?

ঃ মানুষ অনেক সময় অন্যায় জেনেও অনেক কিছু করে। আমিও হয়তো তাই

করছি। মনে হচ্ছে তুমি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার নি?

ঃ এই কথায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা আসছে কেন? আপনাকে অবিশ্বাস করার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়।

ঃ তোমার মৃত্যু হলে কায়সারেরও মৃত্যু হবে।

সাবিহা ছল ছল নয়নে বলল, এ রকম কথা উচ্চারণ করতে পারলেন?

ঃ কেন পারব না? তুমি পারলে আমি পারব না কেন?

ঃ আমার অন্যায় হয়েছে, মাফ করে দাও।

ঃ আমারও অন্যায় হয়েছে, মাফ করে দাও।

ঃ অমানুষ।

ঃ আমি অমানুষ হলে, তুমি অমেয়েমানুষ।

ঃ তাহলে আপনি অমানুষ স্বীকার করছেন?

ঃ করলাম।

ঃ আচ্ছা আপনি কি?

ঃ কেন? তুমি তো এক্ষুনী বললে, অমানুষ।

ঃ অমানুষ হওয়া বুঝি ভাল?

ঃ না।

ঃ তবে বললেন কেন?

ঃ তুমি বললে বলে।

ঃ বলে অন্যায় করেছি। আর বলব না।

ঃ এবার থেকে তা হলে মানুষ কি বল?

ঃ আপনার কি মনে হয়?

ঃ আল্লাহ্ পাক মানুষ করেই আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।

ঃ তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার আচার-ব্যবহার মাঝে মাঝে অমানুষের মত।

ঃ তা হবে হয় তো। আবার কিন্তু অমানুষ বলছ?

ঃ ভুল হয়ে গেছে, আর বলবনা। মাফ করে দাও।

ঃ অত মাফ করতে পারব না।

ঃ কেন?

ঃ বেশী মাফ করলে তোমার সাহস বেড়ে যাবে।

ঃ কি করবে তা হলে?

ঃ শাস্তি দেব।

ঃ তাই দাও।

ঃ এখন নয় সময় মত দেব।

ঃ আজ তুমি ফাজলামি করছ।

ঃ তুমি করছ বলে।

ঃ আর করব না।

ঃ তাহলে আমিও করব না। এই আগামী সপ্তাহে আসবে তো?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ জানি না।

ঃ আমি তাহলে তোমাদের বাড়ী এসে পড়বো।

ঃ সত্যি আসবেন?

ঃ তোমার কি মনে হয়?

ঃ আসবেন।

ঃ আমি গেলে কিন্তু তোমার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব।

ঃ দিতে পারবেন?

ঃ কেন পারব না? বিয়ে যখন করতে পারব তখন প্রস্তাব দিতে পারবনা কেন?

ঃ দেখা যাবে আপনার সাহস কত?

ঃ তাই দেখো।

ঃ এবার তা হলে যাই?

ঃ যাবে তো নিশ্চয়, আর একটু বস।

ঃ দেরী হলে ভাবী, মা ও বাবার অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

ঃ আমি তাই চাই।

ঃ আমাকে বকাবকি করলে, খুব খুশী হবেন বুঝি?

ঃ হব।

ঃ পাষাণ।

ঃ আমার তো মনে হয়, আমার চেয়ে তুমি বেশী পাষাণ।

ঃ কি করে?

ঃ তোমার কথা শুনে।

ঃ বুঝলাম না।

ঃ না বুঝার কি আছে? তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না বলে তোমার বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাচ্ছি। আর তুমি কিনা তাতে বাধা সৃষ্টি করছ।

ঃ আমি আবার বাধা সৃষ্টি করলাম কি করে?

ঃ আপনি শুধু উল্টো-পাল্টা কথা বলে আমাকে দোষী করছেন। কখন আমি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে নিষেধ করলাম। কথা শেষ করে সাবিহা ওড়নায় চোখ

মুছল।

ঃ এই ছিঁচ কাঁদুনে মেয়ে, সামান্য কথায় কাঁদছ কেন? ঠিক আছে, আর ঐ কথা বলব না। তারপর সাবিহার চিবুক ধরে বলল, একটু রসিকতা করলাম আর তুমি সেটা সিরিয়াস ভাবলে?

এমন সময় কারো চাপা কাশির শব্দ শুনে কায়সার দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে বসে বলল, তুমি কি কারো কাশির শব্দ শুনতে পেয়েছ?

ঃ কই না তো। কেউ কাশলে আমিও নিশ্চয় শুনতে পেতাম। কোন পশু-পাখির গলার শব্দ মনে হয় শুনেছ।

ঃ তাই হয় তো হবে। আমার শোনারও ভুল হতে পারে। আজ আর ছবি আঁকবো না। চল ফেরা যাক, বেলা বেশী নেই। প্রতিবারের মত একসঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে কিছুদূর একসঙ্গে এসে দুজন দুজনের পথ ধরল।

হাবিব পরিকল্পনা মত আজ সাবিহাকে ফলো করে এসে কাছাকাছি একটা গাছের আড়াল থেকে তাদের দুজনের সবকিছু দেখছিল ও শুনছিল। হঠৎ গলা সড়সড় করতে কেশে উঠে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে আসার সময় চিন্তা করল, ওরা তো অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তাহলে আমি কি সাবিহাকে পাবো না? কথাটা চিন্তা করে মাথা গরম হয়ে গেল। কোথাকার কে কায়সার তার আশা-আকাঙ্খা চূর্ণ করে দেবে, তা হতে পারে না। আমিও দেখবো কি করে সে সাবিহাকে বিয়ে করে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। সাবিহার সঙ্গে হাবিবের আজ পর্যন্ত কোন আলাপ হয় নি। ভাবল, আজ আলাপ করতে হবে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে একটা পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তার ধারে পাথরের উপর বসে রইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাবিহাকে তার সামনে দিয়ে চলে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে বলল, শুনুন।

সাবিহা হাবিবকে ভাইয়ার ব্যবসার ম্যানেজার হিসাবে চেনে। কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু কোন কথাবার্তা বলে নি। তবে সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে, হাবিব তার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দু-একবার চোখে চোখও পড়েছে। তখন মনে হয়েছে তার দৃষ্টিতে কামনার আগুন রয়েছে। সেই জন্যে সে তাকে সব সময় এড়িয়ে চলে। ধারে কাছে কোন দিন যায় নি। আজ তাকে এত কাছ থেকে ডাকতে দেখে মনে মনে রেগে গেলেও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কিছু বলবেন?

ঃ কোথায় গিয়েছিলেন?

ঃ সেটা জেনে আপনার কোন লাভ নেই।

ঃ থাকতেও তো পারে।

সাবিহা ভ্রুকুঁচকে বলল, কথাটা বুঝলাম না।

ঃ না বোঝার কি আছে। অবশ্য ইচ্ছা করে যদি না বোঝার ভান করেন, তাহলে

আমার কিছু বলার নেই ।

ঃ অমন প্যাঁচাল কথা আমি পছন্দ করি না। যা বলার স্পষ্ট করে বলুন।

ঃ মনে হচ্ছে আপনি রেগে যাচ্ছেন। যদি তা না হয়, তাহলে চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।

হাবিবের সাহস দেখে সাবিহা আরো রেগে গেল। বলল, বেড়াবার সময় আমার নেই। তাছাড়া আপনার সঙ্গেই বা বেড়াতে যাব কেন? আর কখনো এরকম কথা বলবেন না। চলি আসরের নামাযের সময় শেষ হয়ে আসছে। তারপর হাবিবের কথা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেল। সাবিহা আগে কোনদিন নামাজ রোজা করে নি। কায়সারের সঙ্গে মেলামেশার পর তাকে ধার্মিক জেনে নামাজ ধরেছে।

হাবিব সাবিহার চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে তার ভারী নিতম্বের উত্থান পতন এবং তার যৌবন ঢলঢল চেহারা দেখে ভাবল, কি সুন্দর ফিগার। এরকম মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে জীবন বৃথা। সঙ্গে সঙ্গে কায়সারের কথা মনে পড়তে চোয়ালটা আপনা থেকে শক্ত হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, সাবিহা, তোমাকে যদি বিয়ে করতে নাও পারি, তবু এক বারের জন্যে হলেও তোমার যৌবনের মধু পান করবই। তাতে যদি সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠে, তাহলে বাঁকা আঙ্গুলে তুলবো। কয়েক দিন পর হাবিব ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসে তার মাকে দিয়ে সাবিহাকে বিয়ে করার কথা বাবাকে জানাল।

হাবিবের বাবা আজরাফ সাহেব স্ত্রীর কাছে ছেলের কথা শুনে বললেন, তা কি করে হয়? ওরা হল পাহাড়ী। ওদের সঙ্গে আমাদের রীতিনীতির অনেক তফাৎ? তাছাড়া পাহাড়ীরা বিয়ে-সাদীর ব্যাপারে খুব কড়া। নিজেদের গোত্র ছাড়া অন্য কোনখানে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। দেলওয়ার সর্দার নিজেদের সমাজের রীতি নীতির বাইরে কিছু করতে পারবে না। হাবিবকে ঐ মতলব ছাড়তে বল। আমি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করবো।

হাবিব মায়ের মুখে বাবার কথা শুনে বলল, তুমি বাবাকে বলো, দেলওয়ার সর্দারের মেয়েকে ছাড়া আমি অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করব না। কয়েক দিন বাড়ীতে থেকে সে কর্মস্থলে ফিরে এল। একদিন কথায় কথায় হাবিব আদিলকে বলল, যদি অনুমতি দেন, তাহলে একটা কথা বলতে চাই। কথাটা শুনে আমাকে ভুল বুঝে রেগে যেতে পারেন। তাই দ্বিধাবোধ করছি।

আদিল বলল, কথা যদি সত্য হয়, তাহলে দ্বিধা থাকা উচিত না। আপনি নিশ্চিন্তে বলতে পারেন।

ঃ সাবিহা প্রতি শুক্রবার বিকেলে কোথায় যায় একটু লক্ষ্য রাখবেন। এর বেশী কিছু বলতে পারব না।

আদিল কয়েক সেকেণ্ড তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলল, লক্ষ্য

রাখতে যখন বললেন তখন এর ভিতর আরো কিছু কথা আছে, যা গোপন করছেন।

ঃ তা আছে। সেটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা বুঝবেন।

ঃ মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আপনি জানেন । বললে কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যবস্থা নিতাম।

ঃ সাবিহা প্রতি শুক্রবার বিকেলে সেই কায়সার ছেলেটার সঙ্গে ঝর্নার দিকে একপাহাড়ে দেখা-সাক্ষাৎ করে।

কথাটা শুনে আদিল খুব রেগে গেলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, কার সম্বন্ধে কমেন্ট করছেন জানেন?

ঃ জানি বলেই তো বললাম। কোথাকার কে একটা সামান্য পোস্টমাস্টারের সঙ্গে আপনার বোনের মেলামেশা আমার চোখে খারাপ লাগল। তার ওপর ছেলেটা ঢাকার। ঢাকার ছেলেরা যে কত ফটকা এবং চরিত্রহীন, তা আপনিও জানেন।

আদিল বলল, কথাটা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ষষ্ঠ

দুদিন পর হাবিব মাল নিয়ে চট্টগ্রাম ডেলিভারী দিতে চলে গেছে। শুক্রবার দুপুরের খাওয়ার পর আদিল সাবিহার দিকে লক্ষ্য রাখল। এক সময় তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেখে সে তার পিছু নিল।

আজ কায়সারের আসতে একটু দেরী হল। কারণ পাহাড়ী রাস্তায় আসবার সময় সে পা মুচড়ে পড়ে গিয়ে বেশ ব্যথা পেয়েছে।

সাবিহা তাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে এগিয়ে গিয়ে সালাম বিনিময় করে বলল, পায়ে কি হয়েছে? খোঁড়াচ্ছেন কেন?

ঃ আসবার সময় গর্তে পা পড়ে মুচড়ে গেছে, তাই দেরী হল।

ঃ কই দেখি কোথায় লেগেছে বলে সাবিহা বসে পড়ে তার পায়ে হাত দিতে গেলে কায়সার তার হাত ধরে তুলে বলল, কি পাগলামী করছ? পা মুচড়ে পড়ে গিয়ে একটু ব্যথা পেয়েছি । ট্যাবলেট খেলে সেরে যাবে। চল বসে একটু চা খাওয়া যাক।

সাবিহা চায়ে চুমুক দেবার আগে ভিজে গলায় বলল, আমার জন্যে আপনার এরকম হল। তারপর চা খেয়ে চোখ মুছল।

কায়সার তার চোখে পানি দেখে বলল, তোমার কথাটা পুরো সত্য নয়। তুমি না এলেও আমি ছবি আঁকতে আসতাম। তবে সমবেদনা জানাবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবার বল কেমন আছ?

ঃ আল্লাহ পাকের রহমতে এবং তোমার দোওয়ার বরকতে ভাল ছিলাম। কিন্তু

এখন শারীরিক ভাল থাকলেও মানসিক না।

ঃ মনে হয় আপনি খুব অন্যমনস্ক থাকেন?

ঃ কি করে বুঝলে?

ঃ তা না হলে বার বার পড়ে যান কেন?

ঃ বার বার তো পড়ি নি। এতদিনে পড়েছি মাত্র দু বার। প্রথম বার তোমাকে ধরতে গিয়ে। আর আজ আসবার সময় তোমার গত সপ্তাহের কথা মনে পড়ল, সত্যিই যদি তুমি না আস তখন পা-টা বেজায়গায় পড়ে মুচকে গেল।

সাবিহা ফুঁপিয়ে উঠে মুখে ওড়না চাপা দিয়ে বলল, আমি বড় পাপী ও হতভাগী। তাই আমার কারণে আপনি বার বার কষ্ট ভোগ করছেন।

ঃ কে ভাল, কে পাপী, তা আল্লাহ পাক জানেন। একটা কথা জেনে রেখ, একজনের পাপে অন্য জন ভোগে না। যে যার কর্মফল ভোগ করে। আর যার তকদ্বীরে যা আছে তা হবেই। তুমি কোন দিন আমার সামনে নিজের সম্বন্ধে ঐ রকম বলবে না। আমার কষ্ঠ যেমন তোমার মনে ব্যথা দেয়, তেমনি তোমার কান্না আমার মনেও ব্যথা দেয়। এখন কান্না থামাও বলে নিজেই তার চোখ মুখ মুছে দিল।

ঃ সে দিন কি আপনি আমার কথায় মনে কষ্ট পেয়েছেন? জানেন, এই কদিন সেই কথা ভেবে খুব অশান্তি পেয়েছি।

ঃ কই সেদিন তো মনে কষ্ট পাবার মত কোন কথা বলেছ কি না মনে পড়ছে না।

ঃ ঐ যে আপনি যখন বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন বললেন, তখন আমি বললাম, আমাদের সমাজের বাইরে কোন ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবার রীতি নেই। আপনার মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে বাবা আপনার ওপর খুব রেগে যাবে এবং আমার ওপর খুব রাগারাগি করবে। ফলে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। আর আমার বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করবে।

ঃ শোন সাবিহা, তুমি আমাকে কতটা জেনেছ জানি না। আমি কিন্তু তোমাকে সম্পূর্ণ জেনেছি এবং মনের গোপন কুঠরিতে স্থায়ীভাবে বসিয়েছি। সেখানে একমাত্র তুমি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের স্থান নেই। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ তোমাকে বিয়ে করবই। সেজন্য যদি আমাকে তোমাদের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে হয় তবুও। বিয়ে-সাদীর ব্যাপার আল্লাহ পাকের মর্জির ওপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করছি। তোমাকেও তাই করতে বলছি। সেদিন তোমাকে কথায় কথায় যা বলেছি তা সত্য নয়। আমি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করব না। তোমার ডিগ্রী পরীক্ষার পর করব। তবে এর মধ্যে যদি তোমার অন্যত্র বিয়ের কথাবার্তা হয় তখন আর অপেক্ষা করব না।

ঃ কি করবেন?

ঃ যখন করবো তখন দেখবে।

ঃ এখন বলুন না।

ঃ বলা যাবে না।

ঃ কেন?

ঃ বললে আমার প্লান ভেস্তে যাবে।

ঃ এখানে তো কেউ নেই, যে শুনে বাবাকে বলবে।

ঃ বাতাসেরও কান আছে।

ঃ আসলে আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই বলছেন না।

ঃ মানুষ নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করে। তোমার কথাতে বোঝা যাচ্ছে, তুমিই আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছ না। তা না হলে তোমাদের সমাজের বাধার কথা বলতে না। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাও তুলতে না। যদি তাই হয়, তাহলে তুমি আর কোন দিন আমার কাছে এসো না। জানবো, স্বপ্নের মত মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমার মানুষীকে পেয়েছিলাম। জীবন সঙ্গীনী হিসাবে পাওয়া আল্লাহ পাক তকদ্বীরে লিখেন নি, তাই পেলাম না। তকদ্বীরের কথা ভেবে সবর করে সারা জীবন কাটিয়ে দেব। কথা শেষ করে কায়সার ব্যাগ ও ফ্লাক্স কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, চলি আল্লাহ হাফেজ, তারপর সে চলে যেতে লাগল।

সাবিহা প্রথমে আগের ঘটনার মত এটাকেও তার ছলনা মনে করে বসে থেকে তার চলে যাওয়া দেখছিল। তারপর সত্যি সত্যি কায়সারকে বেশ কিছুদূর চলে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটতে ছুটতে বলল, কায়সার যেওনা বলছি। সেদিনের আমার কথা মনে নেই বুঝি? তবু তাকে চলে যেতে দেখে কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, এই শেষবারের মত বলছি দাঁড়াও নচেৎ সত্যি সত্যি পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়বো। পাহাড়ী মেয়েরা অল্প শিক্ষিত হলেও তারা কোন দিন মিথ্যা অভিনয় করে না।

কায়সার সাবিহার কথা শুনে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাবিহা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। কায়সার সেখানেই বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসে বলল, আমার অন্যায় হয়েছে মাফ করে দাও। আর বিয়ের আগে জড়িয়ে ধরতে তোমাকে নিষেধ করে ছিলাম মনে নেই?

সাবিহা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, মনে আছে। কিন্তু তোমাকে সত্যি সত্যি চলে যেতে দেখে সে কথা মনে ছিল না। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

ঃ এ ব্যাপারে মাফ করার মালিক আল্লাহ। তিনি আমাদেরকে মাফ করুন।

ঃ আমার এই সামান্য কথায় এতবড় শাস্তি দিতে পারলে?

ঃ শাস্তি দেবার জন্য চলে যাচ্ছিলাম না। দেখলাম আমার সাবিহা কতটা আমাকে চায়।

ঃ আর কতবার এবং কতদিন দেখবে?

ঃ আর দেখবো না। দেখার কাজ শেষ। এখন মাফ করেছ কি না বল।

ঃ করব না। করলে তো আবার পরীক্ষা করে দেখবে।

ঃ এক্ষুনী বললাম না, দেখার কাজ শেষ।

ঃ কথাটা মনে থাকবে তো?

ঃ থাকবে।

ঃ তাহলে মাফ করে দিলাম। এবার তুমিও আমাকে মাফ করেছ কিনা বল।

ঃ করব না। করলে তো আবার বোকার মত অন্যায় করবে?

ঃ আমি বুঝি বোকা?

ঃ তা নয় তো কি?

ঃ প্রমাণ কর।

ঃ প্রমাণ আর কি করব। প্রতিটা পরীক্ষায় ফেল করে কেঁদে কেঁদে পাস করছ।

ঃ সত্যি তোমার পরীক্ষার অভিনয়গুলো এত নিখুৎ, যে কেউ দেখলে সত্যি মনে করবে। এবার তা হলে ওয়াদা করলে, আর কখনো অভিনয় করে পরীক্ষা করবে না?

ঃ ইনশাআল্লাহ করলাম। সেদিনের পর আর কোন পরীক্ষা করার ইচ্ছা ছিল না। তবু আজ কেন করলাম শুনবে?

ঃ বল।

ঃ তোমার মুখে আমার নাম শুনবো বলে। আর আপনি থেকে তুমিতে নামাবার জন্যে।

সাবিহা লজ্জা পেয়ে বলল, সত্যি কখন যে আপনার নাম ধরে ডেকেছি এবং আপনাকে তুমি করে বলেছি তার খেয়াল নেই। কায়সার তার পিঠে একটা আদরের চপেটাঘাত করে বলল, আবার আপনি? তুমি করে না বললে সত্যি সত্যি চলে যাব কিন্তু।

ঃ ঠিক আছে আর বলব না। তুমি কিন্তু এক্ষুনী ওয়াদা ভঙ্গ করতে যাচ্ছিলে।

ঃ তোমাকে ওসিলা করে আল্লাহ পাক আমাকে ওয়াদা ভঙ্গ করার গোনাহ থেকে রক্ষা করলেন। সে জন্যে তাঁর দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ঃ একটা কথা জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে করবে না বলো?

ঃ না করব না।

ঃ তোমার একটা ফটো দিবে?

ঃ আমার কাছে কোন ফটো নেই। থাকলে দিতাম। পড়াশুনা করার সময় কয়েকবার পাসপোর্ট সাইজ তুলেছিলাম। থাকলে বাড়ীতে থাকতে পারে। বিনা প্রয়োজনে সখ করে আমি কোন দিন ফটো তুলি নি।

ঃ কেন?

ঃ বিনা প্রয়োজনে ফটো তোলা ইসলামে নিষেধ।

ঃ কারণটা বুঝিয়ে দেবে?

ঃ অনেক কারণ থাকতে পারে। আমি যা জানি বলছি, প্রথমত, যে ঘরে মানুষের বা কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। এটা হাদিসের কথা।

দ্বিতীয়ত, ফটোর মালিককে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে গিয়ে অনেকে ফটোতে ফুলের মালা পরায়, হাত জোড়ো করে, মাথা নিচু করে। এগুলো ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাজায়েজ। তৃতীয়ত, হজরত মহম্মদ (সঃ) এবং অন্যান্য নবী রসওলগণকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন মূর্তি ধ্বংস করার জন্য। এখন আমরা মূর্তি না গড়েও যদি ফটো তুলি, তাহলেও গোনাহ হবে। কারণ মূর্তি যেমন মানুষের ও প্রাণীর হয় তেমনি ফটোও তো মানুষের এবং প্রাণীর। তফাৎ শুধু মূর্তিগুলো পাথরের, মাটির, কাঠের অথবা অন্যান্য ধাতুর। আর ফটো হল কাগজের। আসলে মূর্তি মূর্তিই, তা সে যে কোন জিনিসেরই হোক না কেন? এ সম্বন্ধে আমি তত জ্ঞান অর্জন করি নি। তাই যতটুকু জানি বললাম। মনে হয় সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা বুঝতে পেরেছ?

ঃ হ্যাঁ পেরেছি। তা হলে তুমি এত ছবি আঁক কেন?

ঃ ছবি আঁকতে ইসলামে নিষেধ নেই। তবে বললাম না কোন প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ।

ঃ তুমি তাহলে কখনো কোন প্রাণীর ছবি আঁকনি? এমন কি কোন মানুষের ছবিও না?

ঃ না আঁকি নি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সঃ) যা নিষেধ করেছেন, তা করা কি কোন মুসলমানের উচিত?

ঃ না উচিত না। আচ্ছা তুমি কতদিন থেকে ছবি আঁকছ?

ঃ খুব ছোট বেলা থেকে।

ঃ এতদিন কি এত সব ছবি এঁকেছো?

ঃ এক কথাই প্রাণীর ছবি ছাড়া পৃথিবীতে যা কিছু আছে।

ঃ আমার ছবি আঁকতে মন চায় না?

ঃ চায়।

ঃ তাহলে আঁকনি কেন?

ঃ ডবল বোকা।

ঃ কেন?

ঃ তা নয় তো কি? ঐ যে হিন্দুরা একটা প্রবাদ বাক্য বলে, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে

সীতা রামের মাসি। প্রাণীর ছবি আঁকার নিষেধের এতকথা শুনে উনি বলছেন কিনা, কেন আমার ছবি আঁকছ না।

ঃ তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমিও তোমাকে পরীক্ষা করে দেখলাম।

ঃ তাই নাকি? তা কি দেখলে?

ঃ তুমি কতটা চালাক।

ঃ তার ফলাফল কি?

ঃ মোটেই ভাল নয়। আমার মত ডবল বোকা।

ঃ কি করে?

ঃ আমার ছবি আঁকার কথা শুনে তোমার বোঝা উচিত ছিল, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছি।

ঃ এখন তো দেখছি, তোমাকে বোকা বলে ভুল করেছি।

ঃ না ভুল করো নি। ভুল যেটা দুজনেরই হচ্ছে, সেটা হল, আসরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরি চল, নচেৎ নামায কাযা হয়ে যাবে।

ঃ সত্যি দারুণ কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ফিরতে ফিরতে নামায কাযা হয়ে যাবে। এক কাজ করি চল, আমার কাছে মসাল্লা আছে। নিচে গিয়ে নদীর পানিতে অজু করে একজন একজন করে নামায পড়ে তারপর রওয়ানা দেব।

ঃ ঠিক বলেছ। তাই করি চল। নামাজ পড়ে সাবিহাকে বিদায় দেবার সময় কায়সার বলল, তোমার যদি কোন ফটো থাকে, তাহলে আগামী দিনে নিয়ে এস।

সাবিহা বলল, আচ্ছা নিয়ে আসব।

আদিল বোনকে ফলো করে এসে এতক্ষণ বনের আড়ালে থেকে তাদের সবকিছু দেখে শুনে ফেরার পথে চিন্তা করল, সাবিহা ও কায়সার দুজন দুজনকে ভীষণ ভালবাসে। মনে হয় হাবিবও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু এটা তো সম্ভব নয়। প্রথমত, শহরের বাবুদেরকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। দ্বিতীয়ত, শহরের বাবুদের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক করতে পারি না। হাবিবের কথা যাঁচাই করার জন্য বোনকে ফলো করে এসে কায়সারকে দেখে আদিল প্রথমে খুব রেগে যায়। কিন্তু যখন পুরো ঘটনাটা দেখে ও শুনে, তখন একদিকে যেমন তাদের গভীর সম্পর্কের কথা জানতে পারল, অন্য দিকে তেমনি বোনের পরিণতির কথা ভেবে শিউরে উঠল। কায়সারকে প্রথমে খারাপ ছেলে ভাবলেও পরে তার কথাবার্তা ও আচরণে তা মনে হল না। ছেলেটা যে খুব ধার্মিক আদিল তা বুঝতে পেরে আরো ভাবল, সে যতই ভাল হোক তা বলে সাবিহার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারি না। বাবা জানতে পারলে কি করবে কি জানি। হয়তো ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। দুটো না পাঁচটা না, একটা মাত্র বোন। তার কিছু হলে আমি কি ঠিক থাকতে পারব? এইসব চিন্তা করে আদিলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবল,

গোপনে কাউকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে কায়সারের এদিকে আসা বন্ধ করে দিতে হবে। আর সাবিহার তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার কথা বাবাকে বলতে হবে।

রাত্রে স্বামীর মন খারাপ দেখে তার স্ত্রী লুবাবা জিজ্ঞেস করল, আজ তোমার কি হয়েছে?

আদিল বলল, কিছু হয় নি।

ঃ তাহলে মন খারাপ করে রয়েছ কেন?

ঃ পুরুষদের মন অনেক কারণে খারাপ থাকে।

ঃ তা হয়তো থাকে, তবে স্ত্রীরও জানার অধিকার আছে।

ঃ তা আছে, শুনলে তোমারও মন খারাপ হয়ে যাবে।

ঃ হোক খারাপ, তবু বল।

আদিল সাবিহা ও কায়সার বাবুর ঘটনাটা বলল।

ঃ লুবাবা বলল, ঘটনাটা আমি আগেই জেনেছি।

ঃ কি করে জানলে?

লুবাবা প্রথম দিকের ঘটনা চেপে গিয়ে শুধু বলল, বাবু যখন পাহাড় থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এবং বাবা খবর পেয়ে লোকজন নিয়ে বাড়ীতে যখন আনে তখন সাবিহার কান্না এবং বাবুর প্রতি তার সেবা-যত্ন দেখে আমি বুঝতে পারি।

ঃ বোঝার পর তাকে সাবধান করে দাওনি?

ঃ তা আবার দিই নি। কত ভয় দেখিয়েছি, কত বুঝিয়েছি, অনেক রাগারাগিও করেছি কিন্তু তাকে ফেরাতে পারি নি। শেষে তোমাকে ও বাবাকে জানিয়ে দেবার কথা বলতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তোমরা বাধা দিলে আত্মহত্যা করব।

স্ত্রীর কথা শুনে আদিলের মনটা আরো বেশী খারাপ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আল্লাহ ওর ভাগ্যে কি রেখেছে কি জানি।

লুবাবা বলল, আচ্ছা বাবুকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

ঃ তাই করবো বলে আমি ভেবেছি। সাবিহাকে এখন আর শাসন করে কোন কাজ হবে না। কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। ভেবে দেখি, কিভাবে বাবুকে এখান থেকে তাড়ান যায়।

পরের দিন আদিল রবিউলের মাকে গোপনে সাবিহার ঘটনাটা বলে বলল, তোকে আমাদের কওমের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্য একটা যুবতী মেয়েকে টাকা দিয়ে হাত করে ঐ পাহারে পাঠাবি। তাকে বুঝিয়ে বলবি, সে যেন ঐ বাবুর সঙ্গে খুব মাখামাখি করে। দু-তিন শুক্রবার ঐ রকম করলে চলবে। আরো বোঝাবি, তার কোন ভয় নেই । বাবু যদি তার ইজ্জতের উপর হামলা করে, তা হলে আমরা তাকে রক্ষা করব। আমরা সেখানে আড়ালে আবডালে থাকব।

রবিউলের মা বলল, ঠিক আছে ছোট সর্দার, কওম কা ইজ্জৎ কি লিয়ে হাম ইয়ে কাম জরুর করুঙ্গী।

শুক্রবার আসার আগে রবিউলের মা তার জানাশুনা একটা নষ্ট চরিত্রের যুবতী মেয়ে তাবিয়াকে আদিলের দেওয়া বেশ কিছু টাকা দিয়ে বশ করল। তারপর আদিলকে সে কথা জানাল।

শুক্রবার দিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আদিল সাবিহাকে ডেকে বলল, আজ তোকে ঝর্ণা দেখতে নিয়ে যাব, এক্ষুনী তৈরী হয়ে নে। দেরী করে বেরোলে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ভাইয়ার কথা শুনে সাবিহা ভয় পেল। চিন্তা করল, ভাইয়া যদি ঐ পাহাড়ে যায়, তাহলে সেখানে কায়সারকে দেখে কি মনে করবে?

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আদিল আবার বলল, কি ভাবছিস? যাবি না? সাবিহা ভয়ে ভয়ে বলল, হ্যাঁ যাব।

আদিল বলল, তাহলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা তাড়াতাড়ি কাপড় পাল্টে তৈরী হয়ে আয়।

সাবিহা তৈরী হয়ে এসে বলল, চল।

আদিল বোনকে নিয়ে রওয়ানা দিল।

এদিকে কায়সার সেই পাহাড়ে এসে প্রথমে চারিদিকে চেয়ে সাবিহাকে খুঁজল। তাকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ বসে চা খেয়ে ছবি আঁকতে আঁকতে চিন্তা করল, আজ সাবিহা আসতে দেরী করছে কেন? না কোন কারণে আসতে পারল না? এমন সময় পায়ের শব্দ পেয়ে তাকিয়ে একটা উদভিন্ন যৌবনা পাহাড়ী মেয়েকে অনতি দূরে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভাবল, সাবিহা কি কোন খবর দিয়ে একে পাঠিয়েছে? জিজ্ঞেস করল, কে তুমি, এখানে কেন এসেছ?

মেয়েটা বলল, মোর নাম তাবিয়া আছে। ইধার যুসনে আয়া। তোকে দেখতে পেয়ে বাতচিত করতে এলাম। তারপর ছবির স্কেচটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ওটাতে রং দিয়ে কি করছিস বাবু।

তাবিয়া শুধু একটা ছোট ঘাগরা ও ছোট ব্লাউজ পরে রয়েছে। তার উন্নত বক্ষ বেশীরভাগ নগ্ন। কায়সার তার দিকে একবার চেয়ে মাথা নিচু করে নিয়েছে। সেই অবস্থাতেই বলল, আমি ছবি আঁকছি, তুমি এখন চলে যাও।

তাবিয়া এগিয়ে এসে কায়সারের একটা হাত ধরে বলল, মোর একঠো তাসবির বানিয়ে দিবি বাবু?

কায়সার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি মানুষের ছবি আঁকি না।

তাবিয়া আর তার একটা হাত ধরে তাতে চুমো খেয়ে বলল, মোর সাথে গোসা করছিস কেন বাবু? মোর একটা তাসবির এঁকে দে না।

কায়সার একি করছ বলে হাতটা ঝামটা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, বারবার হাত ধর কেন? বললাম না, আমি মানুষের ছবি আঁকি না। যাও এখান থেকে।

তাবিয়া ওদের কওমের খুব ডাকসেটে মেয়ে। সময় সুযোগ মত অনেক বাবুকে দেহ ভোগ করতে দিয়ে টাকা কামাই করে। তার ইজ্জতের কোন ভয় নেই। কায়সারের কথা গ্রাহ্য না করে খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, বাবু তুই খুব ভালা আদমী। তোকে মোর বহুৎ ভালা লেগেছে। তারপর ফ্লাক্সের কাছে গিয়ে বলল, এটাতে কি আছে খাওয়াবি বাবু?

কায়সার ক্রমশ রেগে গেলেও সহ্য করার মত তার ক্ষমতা আছে। চিন্তা করতে লাগলো, মেয়েটাকে কিভাবে ভাগান যায়। বলল, ওটাতে যা আছে খাওয়াব, তবে তার আগে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে, খাবার পর তুমি এখান থেকে চলে যাবে। তাবিয়া আবার খিল খিল করে হেসে বলল, কাহে বাবু, মুই এখানে থাকলে তোর কি লোকসান হবে?

কায়সার বলল, তুমি থাকলে আমি ছবি আঁকতে পারব না।

তাবিয়া বলল, ঠিক হ্যায় প্যাহলা তো খিলাও। বাদ মে দেখা যাবে। তারপর বিস্কুটের প্যাকেট দেখিয়ে আবার বলল, এটাতে কি আছে বাবু?

কায়সার ফ্লাস্কের মুখে চা ঢেলে প্যাকেট থেকে দু-তিন খানা বিস্কুট বের করে তাকে দিয়ে বলল, এগুলো খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাও।

খেতে খেতে তাবিয়া বলল, তুই খাবি না বাবু?

কায়সারের মেয়েটার সাথে খেতে ইচ্ছা করছিল না। বলল, না, আমি এখন খাব না। মেয়েটার খাওয়া শেষ হতে বলল, এবার দয়া করে চলে যাও, আমি কাজ করব।

তাবিয়া হাসিমুখে বলল, ঠিক হ্যায় হামি চলে যাচ্ছি, লেকিন কাল ফির আসব। কায়সার তাকে বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। বলল, তাই এস। তাবিয়া আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাবিয়া চলে যাবার পর কায়সারের ছবি আঁকতে আর ভাল লাগল না। সব গুছিয়ে নিয়ে ফিরে চলল।

আদিল সাবিহাকে নিয়ে ঐ পাহাড়ে এসে কিছুদূর থেকে তাবিয়াকে কায়সারের হাত ধরে কথা বলতে দেখে একটা বনের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাদের কার্যকলাপ দেখে এবং তাবিয়ার হাসি শুনে আদিল সাবিহাকে বলল, তাবিয়ার সঙ্গে পোস্ট মাস্টার কায়সার বাবু না?

তাবিয়া কি ধরনের মেয়ে কওমের সকলের মত আদিল ও সাবিহা জানে। এমনি বাড়ী থেকে রওয়ানার পর থেকে সাবিহার ভয় ভয় করছিল। তার উপর তাবিয়ার মত নষ্ট চরিত্রের মেয়েকে কায়সারের সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখে আরো ঘাবড়ে গেলেও

কায়সারের প্রতি তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা জন্মাল। ভাইয়ার কথার উত্তরে শুধু বলল হুঁ।

আদিল বলল, ছিঃ ছিঃ, কায়সার বাবুকে এরকম বাজে ছেলে ভাবতেও পারছি না। সত্যি শহরের বাবুরা বড় হীন চরিত্রের। চল আজ আর ঝর্ণা দেখে কাজ নেই।

সাবিহা আর কি বলবে। রাগে, ঘৃণায় ও দুঃখে তখন তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ভাইয়া যাতে দেখতে না পায়, সে জন্যে সে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। সামলে নিয়ে কোন রকমে বলল, হ্যাঁ ভাইয়া তাই চল।

এই সপ্তাহটা সাবিহার যেন কাটতে চায় না। সব সময় চিন্তা করছে, বাবুজীর মত ছেলে এরকম করবে স্বপ্নেও ভাবিনি। বাবুজীকে কি চিন্তে ভুল করলাম? তাবিয়াকে কি বাবুজী আগের থেকে চিনতো? মনে হয় চিনতো। তা না হলে তাবিয়া বাবুজীর হাতে চুমো খেলো কেন? তাকে আবার চা-বিস্কুটও খাওয়াল। বাবুজীর সাথে হাসাহাসিও করল। তাহলে বাবুজীও কি শহরের অন্যান্য বাবুদের মত চরিত্রহীন। না-না তা কি করে হয়? এতদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করে সে রকম খারাপ কিছু তো তার মধ্যে দেখি নি। উহ্ আল্লাহ গো আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না। তুমি আমাকে এই দুঃশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা কর । শেষে ভেবে ঠিক করল, সামনের শুক্রবার গিয়ে দেখা করে এর একটা বিহিত করতে হবে। সে যদি সত্যিই লম্পট চরিত্রহীন হয়, তা হলে তাকে যা শাস্তি দেবার দেব। হয় সে মরবে, না হয় আমি মরব।

ঐ দিন সময় মত সাবিহা রওয়ানা দিল। পাহাড়ে পৌঁছে যা দেখল ও শুনল , তাতে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। কোন রকমে টাল সামলে বসে পড়ল।

আদিল জানে সাবিহা সেদিন তাবিয়ার সাথে কায়সারবাবুকে দেখে তার প্রতি রেগে আছে। আজ সাবিহা যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তা আন্দাজ করেছে। তাই সে কওমের কয়েকজন যুবককে ফুর্তি করার জন্য কিছু টাকা দিয়ে বলল,

তোদেরকে আমি এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে একজন বাবু আমাদের কওমের একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। তোরা সেই বাবুকে উত্তম-মধ্যম ধোলাই করে ভয় দেখিয়ে বলবি, আবার যদি কোন দিন এদিকে আসতে দেখি, তাহলে জানে শেষ করে দেব। তবে বাবুকে মারধর করলেও গুরুতর আহত করবি না। মার খাওয়ার পর সে যেন ফিরে যেতে পারে। আমি তোদের থেকে একটু দূরে থাকব। তোরা যখন বাবুকে ধোলাই করবি তখন আমি গিয়ে বাবুকে সাবধান করে দিয়ে মীমাংসা করে ছেড়ে দেব।

কায়সার পাহাড়ে এসে আজও সাবিহাকে দেখতে না পেয়ে মন খারাপ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে চিন্তা করল, সাবিহার কি সত্যি সত্যি কোন অসুখ-বিসুখ করেছে? যদি তাই হয়, তা হলে তো তাদের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ-খবর নেয়া উচিত। কথাটা চিন্তা করে ব্যাগ ও ফ্লাক্স নিয়ে দাঁড়াতে যাবে এমন সময় তাবিয়া পিছন দিক থেকে এসে কায়সারকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবু তুই আজ এত জলদি চলে যাচ্ছিস কেনো?

থোড়াদের বস না, চা বিস্কুট খাব।

কায়সার খুব রেগে গিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, ছেড়ে দাও বলছি।

তাবিয়া নষ্টা চরিত্রের মেয়ে। সে সহজে ছাড়বে কেন? এই রকম করার জন্য রবিউলের মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে।

তাছাড়া বাবুকে সরল-সোজা জেনে তাকে দিয়ে ফষ্টি নষ্টি করিয়ে তার কাছ থেকে আরো টাকা কামাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় জড়িয়ে ধরে বলল, তুই কি মরদ না বাবু? একটা যোওয়ান মেয়ে কি চায় সমঝতে পারছিস না? এখানে কেউ আদমী নেই। মেরা স্যাথ থোড়া মৌজ করতে তোর দিল চাহে না?

তাবিয়ার কাণ্ড ও কথা দেখে-শুনে কায়সার রাগ সহ্য করতে পারল না। কৌশলে বল প্রয়োগ করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তার গালে খুব জোরে একটা চড় মারল।

তাবিয়া মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারলো না।

এতক্ষণ আদিলের লোকেরা অল্পদূরে বনের আড়াল থেকে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। তাবিয়াকে মার খেয়ে পড়ে যেতে দেখে সাত-আটজন যুবক লাঠি হাতে একসঙ্গে কায়সারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে লাগল।

আক্রমণটা কায়সার বুঝে উঠার আগে হওয়ায়, সে প্রথমে মার খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় তারপর ঘটনাটা উপলব্ধি করে একজনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে দাঁড়াতে গেলে অন্য একজন তার মাথায় লাঠির আঘাত করতে আবার ধরাশায়ী হল।

সাবিহা পাহাড়ে উঠে যখন ঐ জায়গায় যাচ্ছিল তখন তাবিয়া কায়সারকে জড়িয়ে ধরে ঐ সব কথা বলতে শুনে লজ্জায়, ঘৃণায় ও রাগে সেদিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে বসে এতক্ষণ হিংস্র বাঘিনীর মত ফুলতে ছিল। হৈ চৈ শুনে সাবিহা উঠে দাঁড়িয়ে কায়সারকে মারতে দেখে ছুটে সেদিকে আসতে লাগল। সে সেখানে পৌছাবার আগে ভাইয়াকে যেতে দেখে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আদিল এসে তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? তারপর কায়সারের দিকে চেয়ে বলল, আপনি?

কায়সারের তখন সঙ্গীন অবস্থা। মার খেয়ে মাথার দু-তিন জায়গা ফেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। হাতে ও পায়ে কয়েক জায়গা ফুলে গেছে। আর কয়েক ঘা লাঠি পড়লে সে জ্ঞান হারাত। আদিলকে দেখে কথা বলার জন্য কোন রকমে উঠে বসল।

কায়সারকে বলার সুযোগ না দিয়ে লোকগুলো বলল, এই বাবু তাবিয়ার ইজ্জৎ লুটে চলে যাচ্ছিল। তাবিয়া বাধা দিতে তাকে মারধর করে পালাচ্ছিল। আমরা দেখতে পেয়ে তার বদলা নিচ্ছিলাম।

আদিল বলল, কায়সার বাবু, আপনাকে একজন ভাল লোক বলে জানতাম। কিন্তু আজ আপনার কাণ্ড দেখে-শুনে ঘৃণা হচ্ছে। আপনি আমার বাবার অসুখের সময় অনেক উপকার করেছিলেন বলে কিছু বললাম না। নচেৎ এতক্ষণ পাহাড় থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম। যান চলে যান। আর কখনো এদিকে আসবেন না। এবারের মত ছেড়ে দিলাম, এরপর জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না। তারপর সবাইকে বলল, তোরা চলে যা আমি পরে আসছি।

সাবিহা যে এখানে আছে তা আদিল জানে। তাকে দেখে সে গাছের আড়ালে লুকিয়েছে, তাও দেখেছে। আদিল আরো বুঝতে পারল, সাবিহা কায়সার বাবুর মুখোমুখি হতে চায়। তাকে সেই সুযোগ দেবার জন্য সে ফিরে যাবার ভান করে কিছুদূর এসে একটা বনের মধ্যে আত্মগোপন করে সাবিহাকে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

সকলে চলে যাবার পর কায়সার উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ ও ফ্লাক্সটা নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে চলল।

কাছাকাছি এলে সাবিহা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে খুব রাগের সঙ্গে বলল, এটাই বুঝি শহরের বাবুদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য? এখন বুঝতে পারছ, কেন আমরা তোমাদের মত বাবুদের বিশ্বাস করি না। তোমাকে দেখেও তোমার মেকি ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যতটা না ভালবেসেছিলাম, এখন তোমার কার্যকলাপ দেখে শুনে তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশী ঘৃণা করি। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে। তুমি যে এতবড় ইতর, লম্পট তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। জেনে রেখ পাপ বাপকেও ছাড়েনা। আর সাগরের পানি যেমন শুকায় না, তেমনি পাপও গোপন থাকে না। আল্লাহ পাকের কাছে কোটি কোটি শুকরিয়া, তিনি আমাকে আগেই সবকিছু জানিয়ে দিলেন। যান চলে যান, আর কোনদিন এদিকে আসবেন না। কায়সারকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বলল, যান চলে যান বলছি নচেৎ কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলব। রাগের মাথায় এরকম কথা বললেও সাবিহার কলজেটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল। কথা শেষ করে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ছুটে ফিরে যেতে লাগল।

কায়সার যেন এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল। সাবিহা যে তাকে ভুল বুঝে এরকম করে বলবে, তা সে কল্পনা করতে পারছে না। সাবিহার কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। তাকে চলে যেতে দেখে বাধা দেবার জন্য ছুটতে গিয়ে পায়ের ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। তবু সে থামল না। দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল, সাবিহা যেওনা, প্লীজ দাঁড়াও। আমাকে ভুল বুঝে চলে যেও না। অন্তত আমার একটা কথা শুনে যাও। তুমি যা দেখেছ, শুনেছ তা সত্য নয়। তোমাকে আমার প্রেমের কসম যেওনা। দাঁড়াও বলছি,

তা না হলে·····কথাটা সে আর শেষ করতে পারল না। হোঁচট খেয়ে পাহাড়ের সরু রাস্তায় টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের অর্ধেক এসে একটা সাল গাছে আটকে যাবার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সাবিহা যেতে যেতে কায়সারের কথাগুলো শুনতে পেয়েও দাঁড়াল না। কায়সারের উপর তখন তার প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা রয়েছে। তার কথাগুলোকে সে চালাকি বলে মনে করল। কিন্তু কায়সার যে পাহাড় থেকে পড়ে গেল, তা সে জানতে পারল না। সারা রাস্তা চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে বাড়ী ফিরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আদিল বনের আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনেছে এবং সাবিহাকে ফিরে যেতে ও কায়সারকে পড়ে যেতে দেখেছে। বোনের ব্যাপার নিয়ে কায়সারের প্রতি সে যতই রুষ্ট হয়ে থাকুক, তার পরিণতি দেখে আদিলের মনে দুঃখ হল। তখন তার মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, আদিল কাজটা তুমি ভাল করলে না। কারো উপর মিথ্যে দুর্নাম দিলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে না। সে তাড়াতাড়ি কায়সারের কাছে গিয়ে তাকে রক্তাক্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় দেখে নিজেকে খুব অপরাধী মনে করল। কায়সারকে দু হাতে তুলে নিচে নেমে নদীর কাছে নিয়ে এসে শুইয়ে দিয়ে আঁজলা করে কয়েকবার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। কিছুক্ষণ পর তাকে নড়ে উঠতে দেখে আদিল জ্ঞান ফিরেছে মনে করে বাড়ী ফিরে চলল।

তাবিয়া কায়সারের হাতের চড় খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। যখন সবাই মিলে কায়সারকে মারছিল তখন সবার অলক্ষ্যে সে উঠে একটু দূরে বনের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে শেষমেষ কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর সবকিছু দেখে বুঝতে পারল, সর্দারজীর মেয়ের সাথে বাবুর পেয়ার ছিল। তাই ছোট সর্দার আমাকে দিয়ে তাদের মধ্যে পেয়ার ছুটাবার জন্যে এই কাজ করাল। বাবুর মত এত ভাল আদমী সে আর কখনো দেখেনি। তার সাথে যা ব্যবহার করেছি তা বহুৎ খারাপ। তাদের দুজনের পেয়ারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমি বহুৎ গোনাহ করেছি। এই কথা ভাবতে ভাবতে তাবিয়ার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। আদিল চলে যাবার পর তাবিয়া কায়সারের কাছে এসে তাকে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে দেখে ভাবল, বাবু বেহুশ আছে। সে তখন দুহাতে করে পানি নিয়ে তার মাথায় দিতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর কায়সার জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসে তাবিয়াকে দেখে ভাবল, মেয়েটা খারাপ হলেও তার জ্ঞান ফিরিয়েছে। বলল, তোমার উপকারের কথা চিরকাল

আমার মনে থাকবে। আল্লাহ পাক তোমার ভাল করবেন।

বাবুর জ্ঞান ফিরতে দেখে একদিকে যেমন তাবিয়া খুশী হয়ে উঠল, অপর দিকে তেমনি ভয় ভয়ও করতে লাগল। মনে করল, এবার বাবু হয়তো তাকে দেখে রেগে গিয়ে আরো মারধোর করবে। তার বদলে বাবুর কথা শুনে তাবিয়া তার পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে উঠে বলল, বাবু হামি বহুৎ গোনাহ করেছি। হামার জন্যে তোর এরকম হল। তুই মানুষ না বাবু, তুই ফেরেস্তা। তুই হামাকে মাফ করে দে। তোকে এরকম করবে মালুম থাকলে হামি রবিউলের মায়ের বাত মানতাম নেহি। বল বাবু তুই হামাকে মাফ করে দিয়েছিস?

কায়সার এতক্ষণে সবকিছু বুঝতে পারল। বলল, তোমার কোন দোষ নেই তা আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। না বুঝে আমি তোমাকে চড় মেরে দোষ করেছি। তুমি বরং আমাকে মাফ করে দাও।

তাবিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, নেহি বাবু নেহি, তোমাহারা কোই দোষ নেহি। তুমকো শহরের বাবু শোচ কর বহুৎ খারাপ বাত বলেছি। হামি বহুৎ খারাপ মেয়ে আছি বাবু। শহরের বাবুদের কা সাথ খারাপ কাম করে রুপিয়া কামাই করি। তুমকো ঐসাহি সমঝকে বুরা কাম করনে বোল কর হামে বহুৎ বড়া কসুর কিয়া। বল বাবু বল, তুম হামকো মাফি কিয়া?

কায়সার বলল, আমি মাফ করার কে? আল্লাহ তোমাকে মাফ করুক। শোন তাবিয়া, যদি আমাকে তুমি ভাল লোক বলে মনে করে থাক, তাহলে কয়েকটা কথা বলছি মন দিয়ে শোন, আল্লাহকে সব সময় ভয় করবে। মৃত্যুর কথা, কবরের কথা চিন্তা করবে। তাহলে গোনাহর কাজ থেকে বাঁচতে পারবে। আর যা কিছু খারাপ কাজ করেছ, সে জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে মাফ চাইবে। আর কখনো কারো কথায় কোন অন্যায় কাজ করো না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে নদী থেকে আঁজলা করে পানি খেয়ে তাবিয়াকে বলল, তুমি এবার বাড়ী যাও। কথা শেষ করে সে নিজের পথ ধরল।

একে দু-তিন জায়গায় মাথায় আঘাত পেয়ে ফেটে গিয়ে রক্ত গেছে, তারপর পাহাড় থেকে পড়ার সময় আঘাত পেয়ে আরো রক্ত যাওয়ার ফলে এবং মারের চোটে কায়সার খুব দুর্বল বোধ করতে লাগল। বেশী দূর হাঁটতে পারলো না। একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। তারপর সে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরের দিন বেলা আটটার সময় জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষিদে অনুভব করে অনেক কষ্টে পাহাড়ে উঠে প্যাকেটের সব বিস্কুট খেয়ে পানি খেল। তারপর দু-তিন কাপ চা

খেয়ে বাসায় ফিরে চলল। দুর্বলতার কারণে ব্যাগ ও ফ্লাক্স নিতে পারল না। যখন সে বাসায় ফিরল তখন বেলা এগারটা। অসুস্থ শরীরে এতটা পথ হেঁটে এসে সে খুব ক্লান্ত বোধ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

সপ্তম

কংকর নটার সময় অফিসে এসে বাবুকে দেখতে না পেয়ে তার বাসায় গেল। দরজায় তালা দেখে ফিরে এসে অফিস খুলে কাজ করতে লাগল। তার কাছেও একটা চাবি থাকে। বেলা দুটো বেজে যেতেও বাবু না আসায় আবার বাসায় গেল।

দরজা এমনি ভিড়ান দেখে ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। বাবুকে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। দুপাশের গাল কয়েক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে। কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারল খুব জ্বর। কয়েকবার বাবু বাবু বলে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এল।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, মনে হয় ইনি কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেছেন। খুব জ্বর। মাথায় পানি অথবা বরফ দেবার ব্যবস্থা করুন। জ্বরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। একটা ইনজেকসান পুশ করে বললেন, জ্ঞান ফিরতে পারে। তারপর কয়েকটা ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট দিয়ে বললেন, জ্ঞান ফিরলে একটা ক্যাপসুল ও একটা ট্যাবলেট একসঙ্গে ছ ঘণ্টা পরপর খাওয়াবেন।

ডাক্তারকে বিদায় করে কংকর কায়সারের মাথায় বেশ কয়েক বালতি পানি ঢালল। বাবুকে চোখ মেলে চাইতে দেখে কংকর জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়ে ছিলেন? এরকম অবস্থা হল কি করে?

কংকরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কায়সারের চোখে পানি এসে গেল। কোন কথা বলতে পারল না। শুধু ইশারা করে ক্ষিধের কথা জানাল।

কংকর পানি ঢালা বন্ধ করে মাথা মুছিয়ে দিয়ে পাঁউরুটি ও মিষ্টি কিনে নিয়ে এল। বাবু উঠে বসতে পারবে না বুঝতে পেরে সে তাকে খাইয়ে দিল। তারপর ঘড়ি দেখে ওষুধ খাইয়ে বলল, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি একটু বাড়ী থেকে আসছি।

বাড়ীতে এসে কংকর স্ত্রীকে বাবুর অসুখের কথা বলে বলল, বাবু বোধহয় পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিল। তার খুব অসুখ। দেখবার কেউ নেই। আমাকেই বাবুকে দেখাশুনা করতে হবে তাই তোমাকে জানাতে এলাম।

কংকরের স্ত্রী মিতালি স্বামীর মুখে বাবুর অনেক প্রশংসা শুনেছে। বাবু উচ্চ শিক্ষিত শহরের লোক হয়েও কংকরের মত পাহাড়ী ছেলের সঙ্গে খুব অমায়িক ব্যবহার করে

জেনে তাকে দেখার তার অনেক দিনের সখ। সেই বাবুর অসুখ শুনে বলল, তুমি মরদ মানুষ, ঠিকমত বাবুর সেবা করতে পারবে না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

পাহাড়ীরা অনুন্নত হলেও তারা বিপদগ্রস্তকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করে। তাই স্ত্রীর কথা শুনে কংকর বলল, তুমি গেলে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। তোমার ও আমার কয়েকটা কাপড়-চোপড়ও নিয়ে নিও। বাবু কবে ভাল হবে তা বলা যায় না।

কংকর যখন মিতালিকে নিয়ে ফিরে এল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কায়সারের সংস্পর্শে থেকে কংকর পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে। কোরান শরীফ পড়তেও শিখেছে। বাড়ীর সবাইকেও সে নামাজ ধরিয়েছে। তারপর কংকর বাবু ঘুমোচ্ছে দেখে না ডেকে কপালে হাত দিয়ে মিতালিকে বলল, এখনো জ্বর খুব রয়েছে। জ্বর না কমা পর্যন্ত ডাক্তার মাথায় পানি দিতে বলেছে।

যে মেয়েটা কায়সারের রান্না করে দেয়, সে সকালে এসে ঘরে তালা দেখে ফিরে গিয়েছিল। আবার বিকেলে এসে বাবুকে শুয়ে থাকতে দেখে কয়েকবার বাবু বাবু বলে ডেকে সাড়া না পেয়ে চলে গেছে।

স্বামীর কথা শুনে মিতালি পানি ঢালার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, তুমি পানি ঢালতে থাক, আমি দুজনের জন্যে একমুঠো আলুভাতে ভাত রান্না করে নিই।

রাত নটার দিকে পানি ঢালা বন্ধ করে বাবুকে ডেকে জাগিয়ে কংকর তাকে দুধ-রুটি খাইয়ে ওষুধ খাওয়াল। কায়সারের তখনও খুব জ্বর। জ্বরের ঘোরে অল্প কিছু মুখে দিয়ে ওষুধ খেয়ে আবার বেহুশের মত ঘুমিয়ে গেল। প্রায় সারা রাত পানি ঢালার পর ভোরের দিকে জ্বর কমতে পানি ঢালা বন্ধ করে কংকর আবার ডাক্তার নিয়ে এল। ডাক্তার কায়সারকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে উত্তর না পেয়ে বললেন, মাথায় ভারী আঘাত পেয়ে খুব সম্ভব বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। উনাকে সিলেট মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করে দিন।

ডাক্তারের কথা শুনে কংকর খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবল, তাই বোধহয় বাবু তাদের সঙ্গে কথা বলে নি। সকালে জ্ঞান ফিরার পর যখন কংকর মিতালির সঙ্গে বাবুর পরিচয় করিয়ে দেয় তখন কায়সার শুধু একবার মিতালির দিকে চেয়ে চুপ করে ছিল । কংকর সেদিনই কায়সারকে মেডিকেলে ভর্তি করে দিল।

প্রায় একমাস হাসপাতালে থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কায়সার সালুটিকুরে ফিরে এল। আসলে কায়সার বাকশক্তি হারায়নি। এই ঘটনায় সে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কারো সঙ্গে কথা বলার তার শক্তি ছিল না। হাসপাতালে আসার আট দিন পর সে কথা বলতে শুরু করে। সেই রাতে রেজিগনেসান লেটার ও কংকরকে একটা চিঠি লিখে রাখল। পরের দিন কংকর আসার আগে রেজিগনেসন লেটার ও কংকরের চিঠিটা এবং চাবির গোছা অফিসের টেবিলের উপর রেখে ঢাকায় নিজেদের বাসায় রওয়ানা দিল।

কংকর অফিসে এসে টেবিলের উপর দুটো খাম ও চাবির গোছা দেখে তাড়াতাড়ি তার নাম লেখা খাম থেকে চিঠি বের করে পড়তে লাগল।

কংকর,

আমার দোওয়া ও আন্তরিক ভালবাসা নিও। পরে জানাই যে, আমার দ্বারা এই চাকরি করা আর সম্ভব হল না। তাই রেজিগনেসান দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম। আল্লাহ পাক যদি রাজী থাকেন, তাহলে তোমাদের বাড়ীতে একদিন বেড়াতে যাব। তুমি ও তোমার স্ত্রী আমার জন্য যা করেছ, তা অতি আপন জনেও করে না। আল্লাহ পাক তোমাদের ভাল করবেন। রুমের চাবিও রেখে গেলাম। ওখানে যা কিছু আছে এবং বালিশের নিচে যে হাজার দেড়েক টাকা আছে, তা থেকে এই মাসের রুমভাড়া দিয়ে যা থাকবে, সেটা তোমাদের দুজনকে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ দিলাম। নিলে আমি খুব খুশী হব। আর যদি এটাকে অজাচিত দান বলে নিতে না চাও, তাহলে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিও। বিশেষ আর কি লিখব। ঢাকায় এলে আমাদের বাসায় বেড়াতে এস। আল্লাহ পাকের কাছে তোমার ও তোমাদের বাড়ীর সকলের কুশল কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি-

তোমার বাবু।

পুনশ্চঃ ঝর্না দেখতে তুমি আমাকে যে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখানে আমি ছবি আঁকতে যেতাম। সেই পাহাড়ে আমার কিছু জিনিসপত্র আছে, সে গুলোও তোমাকে দিলাম।

চিঠি পড়তে পড়তে কংকরের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। চিঠিটা দুবার পড়ল। তারপর ভাঁজ করে পকেটে রেখে ভাবল, নিশ্চয় পাহাড়ীরা বাবুকে কোন কারণে মারধর করে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বাবু যে স্বভাবের লোক, তাতে করে পাহাড়ীরা মারবেইবা কেন। হাসপাতালে বাবুকে জিজ্ঞেস করেও কোন উত্তর পাইনি।

প্রায় সাত-আট মাস পর কায়সার বাড়ীতে এসে আম্মাকে কদমবুসি করে মাফ চাইল।

আকলিমা বেগম ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মাথায় চুমো খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আগে ওয়াদা কর আর এভাবে যাবি না। জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন কোথায় ছিলি।

কায়সার বলল, সিলেটের এক পাহাড়ী এলাকায় পোস্ট মাস্টারী করছিলাম। রিজাইন দিয়ে চলে এসেছি।

হিমুও ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, মাঝে মাঝে চিঠি পত্র দিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করতে পারতে।

রাতে কায়সার আব্বাকে কদমবুসি করে মাফ চাইলে শামসুল আলম সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার ছেলের কাছ থেকে আমি এরকম আশা করি নি। ভবিষ্যতে কোথাও গেলে জানিয়ে যাবে।

ঐদিনের পর থেকে সাবিহা বেশ কয়েক দিন কেঁদে কেঁদে কাটাল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যতই বাবুজীর উপর তার রাগ বা ঘৃণা হোক না কেন, তার কথা মনে পড়লে চোখ দিয়ে গলগল করে পানি পড়তে থাকে। ঐ ঘটনা নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই সে বাবুজীকে অবিশ্বাস করতে পারত না। বাবুজীকে সে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিল, প্রয়োজনে তার জন্যে নিজের জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বাবুজী যে এত খারাপ ও নিচ তা সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই যখন তার এক মন বাবুজীকে জঘন্য চরিত্রের ছেলে মনে করে রাগে ও দুঃখে ফুলতে থাকে তখন তার আর এক মন বলে বাবুজী কখনও এই রকম লোক হতে পারে না। দোঠেলায় পড়ে সাবিহা খুব অস্থিরতার সঙ্গে দিন কাটাতে লাগল।

লুবাবা স্বামীর কাছে সব কথা জেনেছে তাই ননদের করুণ অবস্থা দেখে মনে মনে দুঃখ পেলেও মুখে কিছু বলে নি। একদিন তাকে রুমে বসে কাঁদতে দেখে না জানার ভান করে বলল, তোমাকে কদিন খুব উদাস দেখছি। বাবুর সঙ্গে কি মনোমালিন্য হয়েছে?

সাবিহা ভাবীকে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ঘটনাটা বলে বলল, আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, বাবুজী আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে।

আদিল বোনের অবস্থা দেখে স্ত্রীকে বোঝাতে বলেছে। ননদের কথাশুনে লুবাবা প্রবোধ দেবার জন্য বলল, কি করবে বোন সব কিছুই তকদ্বীর। আল্লাহ যা কিছু করে সবই এর ভালর জন্য করে। শহরের বাবুদের চরিত্রই ঐ রকম। ভাগ্যিস আল্লাহ কিছু ঘটবার আগেই তোমাকে জানিয়ে দিল। নচেৎ কি যে হত আল্লাহ মালুম। সে জন্য তাঁর দরবারে শোকর করে সবর কর। আরো কিছুদিন পর সাবিহা ডিগ্রীতে এ্যাডমিশান নিয়ে হোস্টেলে থেকে পড়া শুনা করতে লাগল। এরপর থেকে শহরের লোকদের উপর তার প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মাল। কলেজের কোন ছেলে কোন ব্যাপারে তার সাথে কথা বলতে এলে সে মুখ ঝামটা দিয়ে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে সেখান থেকে সরে যায়।

কায়সার বাড়ীতে আসার কিছুদিন পর একদিন শামসুল আলম সাহেব স্ত্রীর সামনে ছেলেকে বললেন, তুমি আমাদের একমাত্র ছেলে। সবকিছু তুমি না দেখলে আর কে দেখবে? আমি আর কতদিন এসব চালাব। তাছাড়া তোমার ও হিমুর বিয়ে দিয়ে আমরা এবছর হজ্জে যাবার নিয়ত করেছি।

কায়সার বলল, হিমুর বিয়ে দিতে চাও দাও। আমি এখন বিয়ে করব না।

ঃ কেন?

ঃ আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করেছি। তাকে ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করব না।

ঃ বেশ তো, তার সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব। তার পরিচয় বল।

ঃ সিলেটের জৈন্তাপুর পাহাড়ী সর্দারের মেয়ে।

ঃ সেই অসভ্য ও জঙ্গলী মেয়েকে বিয়ে করে এই সভ্য সমাজে মানুষ হয়ে তুমি সুখ শান্তি পাবে?

ঃ সবকিছু আল্লাহ পাকের মর্জি। আমাদের তকদ্বীরে সুখ শান্তি থাকলে পাব, নচেৎ পাব না।

ঃ কথাটা খুব সত্য। মুখেও সবাই বলে কিন্তু কেউ কথাটার হকিকত চিন্তা করে দেখে না।

ঃ কেউ না করলেও আমি করেছি।

ঃ তা বেশ ভাল কথা। ব্যবসাপত্র দেখার কথা চিন্তা করেছ?

ঃ আরো কিছুদিন পরে করব।

ঃ এখন কি করবে?

ঃ আপাতত কিছুদিন অধ্যাপনা করার চিন্তা করেছি।

ঃ ছেলের খামখেয়ালির কথা চিন্তা করে রেগে গেলেও কিছু বললেন না। চিন্তা করলেন, এতদিন পর স্বেচ্ছায় ফিরে এসেছে। রাগারাগি করলে আবার যদি চলে যায়? একটু গম্ভীর স্বরে বললেন, বেশ, আমার কথা যখন শুনবে না তখন যা ভাল বুঝ কর। কথা শেষ করে তিনি উঠে নিজের রুমে চলে গেলেন।

রাতে ঘুমোবার আগে আকলিমা বেগম ছেলের রুমে গিয়ে বললেন, তুই যে তখন তোর আব্বাকে বললি, একটা পাহাড়ী মেয়েকে পছন্দ করেছিস। তাকে বিয়ে করে কি তুই সুখী হতে পারবি ? তারা অসভ্য, মূর্খ। তাদের আচার-ব্যবহার খুব খারাপ। খেয়ালের বশে কাজটা করে শেষে তুইও যেমন সুখ-শান্তি পাবি না, তেমনি আমরাও পাব না। দু'টো না, পাঁচটা না, তুই আমাদের একমাত্র ছেলে। হিমু পরের ঘরে চলে যাবে। মনের মত বৌ না হলে আমরা সবাই দুঃখ পাব। তার চেয়ে আমাদের ম্যানেজারের মেয়ে ডালিয়াকে বিয়ে কর। তুই তো তাকে দেখেছিস। আমার ও তোর আব্বার খুব পছন্দ। ডালিয়া লেখাপড়া জানা সুন্দরী ও মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। তার সঙ্গে আমরা তোর বিয়ে দিতে চাই। তুই অমত করিস নি বাবা।

কায়সার বলল, নিঃসন্দেহে ডালিয়া পছন্দ করার মত মেয়ে। কিন্তু তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। আমি আমার পছন্দ মত মেয়ে পেয়েছি। সেও ডালিয়ার মত। আর সে পাহাড়ী গোত্রের মেয়ে হলেও মূর্খ নয়, কলেজে পড়ে। তার বাবা পাহাড়ী সর্দার হলেও সভ্য সমাজের মত জীবন-যাপন করে। তুমি দেখে নিও মা, আল্লাহ পাক রাজী থাকলে এমন বৌ তোমাদের এনে দেব, যাকে পেলে তোমরা ধন্য হয়ে যাবে। তারপর সে সাবিহার একটা ফটো মায়ের হাতে দিয়ে বলল, দেখ, এই মেয়েকে তোমার পছন্দ হয় কি না ?

আকলিমা বেগম ফটো দেখে অবাক হয়ে বললেন, আরে, এই মেয়েটা যে প্রায় ডালিয়ার মত দেখতে! আল্লাহ পাকের কুদরত বোঝা মানুষের অসাধ্য।

কায়সার বলল, সে যাই হোক, তোমার পছন্দ হয়েছে কি-না বল।

ছেলের কথা শুনে আকলিমা বেগম বললেন, এত সুন্দর মেয়ে পছন্দ হবে না কেন। তারপর আর কিছু না বলে নিজের রুমে চলে গেলেন। স্বামী জেগে রয়েছে দেখে তাকে ছেলের সাথে যা কথা হয়েছে তা বলে ফটোটা দিয়ে বললেন, এই সেই মেয়ে। মেয়ে দেখতে প্রায় ডালিয়ার মত, তাই না ?

শামসুল আলম সাহেবও ফটোটা দেখে অবাক হয়ে বললেন, ওকে এখন আর কিছু বলো না। কিছুদিন দেখ না, কি করে। তারপর যা করার আমি করব।

আকলিমা বেগম কিন্তু নিষ্ক্রিয় থাকলেন না। পরের দিন হিমুকে বললেন, তুই আজ কলেজ থেকে ডালিয়াকে নিয়ে আসবি।

হিমু মায়ের কথা শুনে তার মনোভাব বুঝতে পারল। বলল, ঠিক আছে আনবো। সেদিন ডালিয়াকে বাসায় নিয়ে আসার সময় হিমু বলল, জানিস, আজ কয়েকদিন হল ভাইয়া ফিরে এসেছে।

ঃ তাই নাকি ? এতদিন কোথায় কি করছিল রে ?

ঃ সিলেটের কোন এক পাহাড়ী অঞ্চলে পোস্টমাস্টারী করছিল। ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

ডালিয়া আর কিছু না বলে চিন্তা করতে লাগল, আমার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা শুনে সে পালিয়ে গিয়েছিল ? না তার পালাবার অন্য কোন কারণ ছিল ? আজ তা জানতে হবে। বাসায় এসে আকলিমা বেগমকে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন খালাআম্মা ?

আকলিমা বেগম বললেন, আল্লাহ পাকের রহমতে ভাল আছি। তুমি ভাল আছ ? তোমার আব্বা-আম্মা ভাল আছেন ?

ঃ জ্বী আমরা সব ভাল আছি।

ঃ যাও মা, হিমুর ঘরে যাও।

হিমু ঘরে নিয়ে এলে ডালিয়ার মুখে চিন্তার ছাপ দেখে বলল, কিরে, কিছু যেন ভাবছিস ?

ঃ জেনে-শুনে জিজ্ঞেস করছিস কেন ?

ঃ তাই যদি হয়, তাহলে যা না ভাইয়ার ঘরে। সে তো ঘরে আছে। ডালিয়া কিছুক্ষণ হিমুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কায়সারের রুমে গেল। ভিতরে ঢুকে দেখল, সে কিছু লিখছে। কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছেন ?

কায়সার সালামের উত্তর দিয়ে লেখা বন্ধ করে মুখ তুলে ডালিয়ার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল। তারপর একবার আপাদমস্তক তাকিয়ে বেশ একটু অবাক হয়ে বলল, আপনি!

ঃ দেখতেই তো পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন ?

ঃ তা হয়েছি। দাঁড়িয়ে কেন বসুন। ডালিয়া একটা চেয়ারে বসে বলল, শুনলাম এতদিন সিলেটে ছিলেন। নিশ্চয়ই সেখানকার অনেক ছবি এঁকেছেন ?

কায়সার মৃদু হেসে বলল, তা এঁকেছি। দাঁড়ান দেখাচ্ছি, বলে রোল করে বাঁধা ছবিগুলো খুলে একটার পর একটা দেখাল। ডালিয়ার কাছে সবগুলোর চেয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার ছবিটা খুব ভাল লাগল। বলল, এই ছবিটা অপূর্ব!

কায়সার বলল, জানেন, এটার আগে এই ছবি আরেকটা এঁকেছিলাম। সেটা চুরি হয়ে যেতে আবার এটা আঁকি। সেটা আরো সুন্দর হয়েছিল।

ডালিয়া বলল, যদি কিছু মনে না করেন, দু-একটা প্রশ্ন করব।

ঃ বেশ তো করুন।

ঃ বাসা থেকে কাউকে কিছু না বলে এতদিন পালিয়েছিলেন কেন ?

ঃ আপনি খুব ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করে ফেলেছেন। তবু বলছি, আল্লাহ পাকের ও রসুল (দঃ)র হুকুম ব্যতিত আমি নিজের মতের বাইরে জোর করে কোন কাজ করি না। আব্বা-আম্মা আমার মতের বাইরে জোর করে কিছু করাতে চাইছিলেন। তাই রাগ করে চলে যাই।

ঃ আব্বা-আম্মার মনে কষ্ট দিতে কি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) বলেছেন ?

ঃ না, বলেন নাই। এটা করা আমার অন্যায় হয়েছে। সে জন্যে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

ঃ আপনার মতের বাইরে কি এমন কাজ উনারা আপনাকে দিয়ে করাতে

চাইছিলেন, বলবেন ?

ঃ আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। অথচ তারা আমাকে না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করেছিলেন।

ঃ বিয়ের পাত্রী যে আমি, তা জানতেন ?

ঃ জানতাম।

ঃ আমাকে আপনার পছন্দ হয়নি তাই না ?

ঃ আপনি অপছন্দ করার মত মেয়ে নন। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে আমার মন চায় না।

ঃ কোন মেয়েকে ভালবাসেন বুঝি ?

ঃ তখন বাসতাম না, এখন বাসি।

ঃ কে সে মেয়ে জানতে পারি ?

ঃ পারেন। তবে সেটা হিমুর কাছে জেনে নেবেন। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।

ঃ ঠিক আছে, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম, সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। তারপর সে হিমুর কাছে ফিরে এল।

হিমু ডালিয়ার মুখ দেখে বুঝতে পারল, ঘটনা ভাল না। জিজ্ঞেস করল, কিরে ভাইয়ার সঙ্গে মিটমাট হল ?

ডালিয়া বলল, কিসের মিটমাট ? গোলমাল কবে হল, যে মিটমাট হবে। তোর ভাইয়া বলল, সে নাকি একটা মেয়েকে ভালবাসে। তার পরিচয় জানতে চাইতে তোর কাছ থেকে জেনে নিতে বলল।

হিমু বলল, মেয়েটা সিলেটের এক পাহাড়ী ললনা।

ডালিয়া বেশ অবাক হয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল, পাহাড়ী ললনা! হিমুও সাবিহার ফটো দেখে কম অবাক হয়নি। ডালিয়ার মত হুবহু দেখতে হলেও মেয়েটা বেশ সুন্দরী। কিন্তু পাহাড়ী মেয়ে বলে তাকে এ বাড়ীতে বেমানান মনে করে তার প্রতি হিমু খুশী হতে পারে নি। তাই ডালিয়ার কথা শুনে বলল, হ্যাঁ, মেয়েটা কোন পাহাড়ী গোত্রের সর্দারের মেয়ে। কলেজে পড়ে। তোকে একটা কথা বলব, রাখবি ?

ঃ বল না কি কথা ?

ঃ তুই ভাইয়ার ঘাড় থেকে ঐ পেত্নীকে নামাবার চেষ্টা কর।

ঃ ডালিয়া একটু রাগের সঙ্গে বলল, কেন আমি তা করতে যাব ?

ঃ তুই রেগে যাচ্ছিস কেন ? কোথাকার পাহাড়-জঙ্গলের এক পেত্নী ভাইয়াকে গ্রাস করবে, আর তুই তা দেখবি ?

ঃ তোরা নামাবার চেষ্টা কর। আমার কথা তোর ভাইয়া শুনবে কেন ?

ঃ শুনবে শুনবে। আমার দৃঢ় ধারণা, তুই-ই ঐ পেত্নীর হাত থেকে ভাইয়াকে বাঁচাতে পারবি। সত্যি করে বল দেখি, তুই ভাইয়াকে ভালবেসে ফেলেছিস কিনা?

ঃ তোর কথা হয়তো ঠিক। তবে তোর ভাইয়ার সাথে কথা বলে যা বুঝলাম, তাতে করে আমার দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।

ঃ কি বলছিস তুই? মনের মানুষকে পাবার জন্যে মেয়েরা কিনা করে। তুই চেষ্টা করে দেখ, ইনশাআল্লাহ্ সফল হবি।

ডালিয়া ম্লান হেসে বলল, ঠিক আছে চেষ্টা করে দেখব। তারপর নাস্তা খেয়ে চলে গেল।

বেশ কয়েকদিন পর ডালিয়া একদিন বায়তুল মোকারমের একটা কাপড়ের দোকানে শাড়ী কিনতে গিয়ে কায়সারের মত একজনকে দোকানের ভিতর বসে থাকতে দেখল। কায়সারের দাড়ী দেখে প্রথমে চিনতে পারল না। পরে সন্দেহ হতে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কায়সার ভাই না ? আসসালামু আলাইকুম।

কায়সার ওয়া আলায়কুম আসসালাম বলে ডালিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, হ্যাঁ কেমন আছেন।

ঃ ভাল। তারপর কায়সারের সামনে শাড়ীর প্যাকেট দেখে বলল, কিছু কিনলেন বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, হিমুর জন্যে একটা শাড়ী কিনলাম।

ঃ আমিও একটা কিনবো, পছন্দ করে দিনতো। তারপর সেলসম্যানকে বলল, আমাদেরকে কয়েকটা শাড়ী দেখান।

ঃ আমার পছন্দ আপনার পছন্দ নাও হতে পারে।

ঃ সেটা আমার ব্যাপার। তবে আপনাকে দোষ দেব না।

কায়সারের পছন্দ মত শাড়ী কিনে একসঙ্গে বেরিয়ে এসে ডালিয়া বলল, আপত্তি না থাকলে কোন ক্যাফেতে বসে একটু গলা ভেজান যাক।

কায়সার বলল, আপত্তি থাকবে কেন? চলুন।

একটা ক্যাফেতে ঢুকে তারা কেবিনে বসল। বেয়ারা এলে ডালিয়া কিছু হালকা নাস্তা ও দুটো কফির অর্ডার দিল।

নাস্তা খেয়ে কফিতে চুমুক দিয়ে ডালিয়া বলল, আপনার দাড়ী দেখে প্রথমে আমি চিনতে পারি নি।

কায়সার মৃদু হেসে বলল, তাই?

ঃ হ্যাঁ, তাই।

কফি খেয়ে ডালিয়াকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কায়সার জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, কিছু বলছেন না যে?

ঃ আপনার কাছে চুপ করে বসে থাকতেও ভাল লাগে।

ঃ কেন?

ঃ কেনর উত্তর কি আপনি বুঝতে পারেন নি?

ঃ কিছু কিছু পারি?

ঃ তবু জিজ্ঞেস করলেন কেন?

ঃ করে দেখলাম।

ঃ কি দেখলেন?

ঃ আমার অনুমান ঠিক কি না।

ঃ ঠিক না বেঠিক বলবেন না?

ঃ ঠিক।

ঃ তাহলে বলুন, কেন আমাকে ভোগাচ্ছেন?

ঃ জেনে-শুনে কেউ যদি ইচ্ছা করে ভুগে, তাহলে আমি কি করব? প্রথম দিন ডালিয়ার আব্বা-আম্মার সঙ্গে কায়সারদের বাসায় গিয়ে তাকে দেখে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে খুব মুগ্ধ হয়ে মনে মনে কায়সারকে ভালবেসে ফেলে। কায়সার ধার্মিক জেনে সেও ধর্মের বই কিনে পড়ে ধর্মীয় আইনের প্রতি আসক্ত হয়ে সেইমত অনুশীলন করে চলেছে। নামায তো পড়েই, এমন কি কোরান পড়তেও শিখেছে। কোরান-হাদিসের ব্যাখ্যাও পড়ে। পর্দার উপকারিতা বুঝতে পেরে বাইরে বোরোবার সময় শুধু চোখ দুটো ছাড়া সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢেকে বের হয়। সেই ভালবাসা এতদিনে আরো বেড়ে গেছে। সেদিন কায়সারের মুখে একটা পাহাড়ী ললনাকে সে ভালবাসে শুনে ডালিয়া দুঃখ পেয়েছে। তারপর থেকে কায়সারের কথা চিন্তা করে গুমরে গুমরে কাঁদে। হিমুর কথায় মনে জোর পেয়েছে। এখন কায়সারের কথা শুনে ভিজে গলায় বলল, আমার কথা কি আপনার মনে পড়ে না?

কায়সার বুঝতে পারল, ডালিয়া তাকে ভালবাসে। কি বলবে চুপ করে ভাবতে লাগল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডালিয়া বলল, কিছু বলছেন না যে?

কায়সার বলল, দেখুন আমি খুব দুঃখিত। সাবিহাকে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালবাসি। সেখানে অন্য কোন মেয়ে স্থান পেতে পারে না। তাকে আমি পাব কি না

আল্লাহ পাককে মালুম । তিনি না করুন যদি তাকে জীবনে নাও পাই, তবু অন্য কোন মেয়েকে আজীবন সেখানে স্থান দিতে পারব না। আপনার মনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আপনি যখন কথাটা তুললেন তখন না বলে পারলাম না।

ঃ সাবিহা নিশ্চয় আমার থেকে বেশী সুন্দরী?

ঃ তার সঙ্গে কাউকে কাম্পেয়ার করে কখনো দেখি নি। তবে আপনি কি ভাববেন জানি না এবং বিশ্বাসও করবেন কিনা জানি না, সাবিহা প্রায় হুবহু আপনার মত দেখতে। আসল কথা কি জানেন, ভালবাসা কোন দিন কম্পেয়ার করে হয় না। যারা তা করে তাদের ভালবাসা খাঁটি নয়।

তার মত হুবহু দেখতে শুনে ডালিয়া প্রথমে বেশ অবাক হল। তারপর বলল, আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন। আমিও আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে আমি আমার অন্তঃস্থলে বসিয়েছি। আপনাকে না পেলেও সারা জীবন আপনার কথা স্মরণ করে কাটিয়ে দেব। তবু আমি আপনার মত অন্য ছেলেকে সে স্থানে বসাতে পারব না।

কায়সার চমকে উঠে বলল, আপনি খুব ভুল করছেন। এমন কথা আর উচ্চারণ করবেন না। এক তরফা প্রেম-ভালবাসা ভীষণ দুঃখজনক। আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে অমানুষ ভেবে আমার কথা মন থেকে একদম মুছে ফেলুন।

ডালিয়া হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, প্লীজ চুপ করুন। আপনাকে যদি কেউ সাবিহাকে ভুলে যেতে বলে, তা হলে আপনি কি পারবেন।

ঃ আমাদের ব্যাপারটা আলাদা। আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি। আমরা একে অপরের জন্য উৎসর্গকৃত।

ঃ আমিও তো নিজেকে আপনার মধ্যে উৎসর্গ করেছি।

ঃ সেটাই তো খুব দুঃখজনক। নিজেকে উৎসর্গ করার আগে আমাকে জানান দরকার ছিল। যদি জানাতেন, তাহলে এরকম পরিস্থিতি হত না।

ঃ জানাবার সুযোগ দিলেন কই? তার আগেই আপনি পালিয়ে গেলেন।

কায়সার বলল, মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল। ভাগ্য আমাদের নিয়ে যেভাবে খেলাচ্ছে, সেই ভাবেই আমরা খেলছি এর বেশী এখন আর কিছু বলতে পারছি না। চলুন এবার ওঠা যাক।

এরপর কায়সার ডালিয়াকে আর ধরা দেয়নি। হিমুর সঙ্গে তাকে অনেকবার বাসায় আসতে দেখেছে। দেখা মাত্র সেই যে বেরিয়ে গেছে রাত নটা-দশটার আগে আর ফিরে নি।

ডালিয়া তার মনোভাব বুঝতে পেরে চোখের পানিতে বুক ভাসায়। তাকে খারাপ

ছেলে ভেবে ঘৃণা করে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, তা করতে গিয়ে তাকে যেন আরো বেশী ভালবেসে ফেলেছে।

বাড়ীতে আসার পর কায়সার আর ছবি আঁকে নি। সিলেট মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাড়ীতে এসে দাড়ী রেখেছে। অনেক চেষ্টা ও তদবীর করে প্রায় এক বছর পর কায়সার সিলেট মহিলা কলেজে বাংলার অধ্যাপক হয়ে জয়েন করল। এখন সে চোখে সব সময় রঙিন চশমা পরে। সিলেটে আসার সময় একশো সি.সি.র সুজুকি হুণ্ডা কিনে তাতে করে এসেছে।

প্রথম দিন ডিগ্রীর বাংলার ক্লাস করতে গিয়ে সাবিহাকে দেখতে না পেয়ে কায়সারের মনটা খারাপ হয়ে গেল। চিন্তা করল, সে কি পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে? অথবা তার কি বিয়ে হয়ে গেছে? কিন্তু গতমাসে এসেও তাকে তো দেখে গেলাম। প্রতি নামাযের পর সে আল্লাহ পাকের কাছে নিজের মনের বাসনা জানিয়ে দেওয়া চাইতে লাগল।

সাবিহার সর্দি-কাশি ও জ্বর হওয়ায় দিন দশেক আগে বাড়ী গিয়েছিল। কায়সার জয়েন করার দুদিন পর সুস্থ হয়ে ফিরে এল। রুমমেট অলকা জিজ্ঞেস করল, কিরে এখন কেমন আছিস?

ঃ ভাল । তুই?

ঃ আমিও ভাল। জানিস বাংলার একজন নতুন প্রফেসার এসেছেন। দেখতে দারুণ। কিন্তু মোল্লা।

ঃ মানে?

ঃ মানে বুঝলি না? সুন্দর ইয়ংম্যান হলে কি হবে, দাড়ী আছে। মসজিদে নামায পড়তেও যায়। তবে মজার ব্যাপার কি জানিস, উনি সব সময় রঙিন চশমা পরে থাকেন। আমার মনে হয়, দাড়ী রেখে মেয়েদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতে লজ্জাবোধ করেন। তাই রঙিন চশমা পরে মনের আশা পূরণ করেন।

সাবিহা ঘৃণার সঙ্গে বলল, শুধু মোল্লাদের দোষ ধরেছিস কেন? সব পুরুষরাই মেয়েদের দিকে ঐ ভাবে তাকায়।

আজ কায়সার ক্লাসে ঢুকে ফার্স্ট বেঞ্চে সাবিহাকে দেখে তার অশান্ত মনে শান্তি ফিরে এল। তারপর মনে মনে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে একটা প্রবন্ধের উপর লেকচার দিতে লাগল।

কায়সারকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে অলকা কুনুয়ের গোঁতা দিয়ে সাবিহাকে ফিস ফিস করে বলল, ইনিই তিনি।

সাবিহা নতুন প্রফেসারের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ঠিক যেন কায়সারের চেহারার মত। তার মনে হল, প্রফেসার যেন রঙিন চশমার ভিতর থেকে তাকে গভীরভাবে দেখছেন। দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে অলকার কানে কানে বলল, তোর কথাই ঠিক। তারপর লেকচার শুনতে শুনতে তার আবার মনে হল, গলাটাও যেন কায়সারের মত। চিন্তা করল, ইনি কি তাহলে কায়সার ? আবার চিন্তা করল, তা কি করে হয়? সে তো আর্টিস্ট। আজ এক বছর ধরে সাবিহা কায়সারকে ভুলে যাবার কত চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভুলতে পারে নি। তার কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের কথা মনে পড়লে কাঁদে। এতদিন পর নতুন প্রফেসারকে দেখে এবং তার গলার আওয়াজ শুনে কায়সারের কথা মনে পড়ে অন্তরটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। চোখ দুটো পানিতে ভরে গেল। মাথা নিচু করে ওড়নায় চোখ মুছল।

অলকা স্যারের লেকচার শুনতে শুনতে হঠাৎ সাবিহার মুখের দিকে চেয়ে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে বলল, কি রে তোর কি হল?

সাবিহা সামলে নিয়ে বলল, হঠাৎ মাথাটা ভীষণ যন্ত্রণা করছে।

অলকা বলল, খুব অসুবিধে হলে স্যারকে বলে হোস্টেলে চলে যা। সাবিহা বলল, ক্লাসটা শেষ হলে যাব।

লেকচার দেবার সময় কায়সার বারবার সাবিহার দিকে চেয়ে দেখেছে। ক্লাস শেষ করে চলে যাবার সময়ও বেশ কয়েক সেকেন্ড তার দিকে চেয়েছিল। চোখে রঙিন চশমা থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা তা বুঝতে পারল না। কিন্তু সাবিহা ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

স্যার চলে যাবার পর সাবিহা হোস্টেলে ফিরে এসে নতুন প্রফেসারের কথা ভাবতে লাগল। নতুন স্যারের সব কিছু কায়সারের মত। অলকা বলল, বাড়ীও ঢাকায়। আচ্ছা লোকের মত লোক দেখতে হলেও কি গলার স্বর এক হয়? শেষে ভেবে ঠিক করল, আগে উনার নাম জানতে হবে। তারপর আরো খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, উনি কায়সার কিনা। যদি দেখি তাই, তাহলে বদলা না নিয়ে ছাড়ছি না। বিড় বিড় করে বলল, বাবুজী তুমি পাহাড়ীদের নরম দীল দেখেছ, তাদের শক্ত দীল দেখনি। এবার বেঈমানি করার ফল ও পাহাড়ী মেয়েদের ইজ্জৎ লুটার লোভ তোমার চিরকালের মত ঘুচিয়ে দেব। তারপর সে মনকে শক্ত করে নিয়মিত কলেজ করতে লাগল।

কায়সার কলেজে জয়েন করার পর প্রতি ছুটির দিন নাস্তা খেয়ে দুপুরের জন্য এক প্যাকেট বিরানী নিয়ে হুন্ডা করে জৈন্তাপুরের সেই পাহাড়ে ছবি আঁকতে আসে।

অষ্টম

ঐদিন তাবিয়া বাবুর ব্যবহারে শুধু অবাক হয় নি, তার জ্ঞানের চোখও খুলে গেছে। সে দিনের পর থেকে নষ্টামী ছেড়ে দিয়েছে। কেবলই তার মনে হয়, আমার কারণে বাবু ঐ রকম শাস্তি পেল। সেদিন আড়াল থেকে সাবিহার কথা শোনার পর থেকে কেবলই তার মনে হয় সাবিহা বাবুকে পেয়ার করত এবং বাবু ভি সাবিহাকে পেয়ার করত । তাই ছোট সর্দার তাদের পেয়ার ছোড়ানে কে লিয়ে হামাকে দিয়ে এই কাম করিয়েছে। অনেকবার সে ভেবেছে, সাবিহাকে সত্য ঘটনা খুলে বলবে। কিন্তু বলতে সাহস করে নি। আসল ঘটনা জানতে পারলে সাবিহা তাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। যেদিন বাবুর কথা তার মনে পড়ে, সেদিন ঐ পাহাড়ে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে কাঁদে আর ভাবে, বাবু কি আর এখানে কভী ভি আসবে না?

একদিন কায়সার ঐ পাহাড়ে ছবি আঁকতে আঁকতে কোন মেয়ের চাপা কান্না শুনতে পেয়ে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। তারপর যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, তাবিয়া তার দিকে চেয়ে কাঁদছে। অচেনার ভান করে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়ে তুমি কাঁদছ কেন?

তাবিয়া কোন কথা না বলে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে গেল। বাবুকে দেখে চেনা চেনা লাগলেও তাবিয়া ঠিক চিনতে না পেরে পালিয়ে আসার সময় চিন্তা করল, এই বাবু ঠিক ঐ বাবুর মত দেখতে। হঠাৎ তার মাথায় এল, এবার সাবিহাকে ঐ বাবুর আসল ঘটনা খুলে বলবে এবং এই বাবু সেই বাবু কিনা দেখার জন্যে তাকে নিয়ে আসবে। যাই শাস্তি দিক আজ তাকে বলবেই।

কলেজ ছুটি থাকায় সাবিহা গতকাল বাড়ী এসেছে। সকালের নাস্তা খেয়ে বৈঠকখানায় এসে বসতে কায়সারের কথা মনে পড়ল। চিন্তাটা কিছুতেই দূর করতে পারছে না। কেবলই তার মনে হচ্ছে, বাংলার নতুন প্রফেসারই কায়সার। এমন সময় জানালা দিয়ে তাবিয়াকে এদিকে আসতে দেখে তার প্রতি পুরনো রাগটা জেগে উঠল। সেদিনের পর রবিউলের মাকে দিয়ে কতবার তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তবুও আসে নি। আসলে রবিউলের মা তাকে ডাকার কথা বলেনি। কারণ যদি তাবিয়া আসল ঘটনা সাবিহাকে জানিয়ে দেয়।

সাবিয়া বেরিয়ে নিচে রাস্তায় এসে তাবিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কাছে এসে কর্কস গলায় বলল, তোকে যে রবিউলের মায়ের হাতে কত বার ডেকে পাঠিয়েছি

আসিস নি কেন?

তাবিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, কই রবিউলের মা তো হামাকে সে বাত এক বারভি বোলা নেহি।

সাবিহা গর্জে উঠে বলল, ভজাতে পারবি?

তাবিয়া বলল, জরুর পারবো।

সাবিহা চিন্তা করলে, তাবিয়া মিথ্যা বলতে পারবে না কিন্তু রবিউলের মা খবরটা না দিয়ে মিথ্যা বলল কেন? তাকে চুপ করে ভাবতে দেখে তাবিয়া সাহস করে বলল, আমি তোকে একটা বাত বলবে। তুই যদি হামাকে ভরসা দিস। বলতে হামার খুব ডর করছে।

সাবিহা বলল, বল কি বলবি। তোর কোন ডর নাই। কিন্তু যদি মিছা বলিস, তাহলে তোকে আজ জানে শেষ করে দেব।

তাবিয়া বলল, সর্দারজী কা কসম, আমি মিছা বলব না। এদের গোত্রের নিয়ম কোন সত্য করতে হলে, সর্দারজীর কসম করতে হয়।

সাবিয়া বলল, কি বলবি বল।

তাবিয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে সেদিনের সব ঘটনা খুলে বলল।

তাবিয়ার কথা শুনে সাবিহা তার দুগালে বেশ জোরে কয়েকটা চড় মেরে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুই কেন আমাকে আগে জানালি না? তোর সংগে ফষ্টি-নাষ্টি করছে জেনে আমি বাবুজীকে কত কড়া কথা বলেছি। ভাইয়া তাহলে তোকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে? তাইতো বাবুজী সেদিন বলেছিল, সাবিহা তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো না। এখন যা শুনলে ও দেখলে তা মিথ্যে।

তাবিয়া বলল, ছোট সর্দারজীর ডরসে হাম তুমকো কুছ বলতে পারি নাই। তুই হামাকে মাফ করে দে। বাবু মানুষ না, ফেরেস্তা। সেদিন তু চলে আনেকা বাদ বাবু পাহাড় সে গীরকে বেহুশ হয়ে যায়। হুশ আনে কা বাদ হামাকে কুছ বলল না। হামার কান্না দেখে হামারি কাছে মাফ চাইলো।

ঃ কেন তোর কাছে মাফ চাইলো কেন?

ঃ আমি বাবুকে পাকড়ে ছিলাম বলে বাবু আমার গালে থাপ্পড় মেরেছিল। কাল আওর আজ এক বাবুকে সেই পাহাড় তাসবির আঁকতে দেখা। লেকিন ঠিক পাহছানতে পারি নাই। তু চল হামারা সাত। তু জরুর পাহছানতে পারবি। এই বাবুর দাড়ী আছে। রঙিন চশমা ভি পরে।

শুনে সাবিহা চমকে উঠে তাবিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলল, কি বললি।

ঃ হামি সাচ বলছি। তু হামারা সাত চল দেখবি।

ঃ ঠিক আছে চল। বাংলার নতুন স্যারের নাম কায়সার চৌধুরী জানার পর তার

সন্দেহটা অনেকটা দৃঢ় হয়েছে। সেজন্যে প্রতিশোধ নেবার সুযোগের অপেক্ষা সাবিহা করছিল। এখন তাবিয়ার মুখে আসল ঘটনা শুনে তার মনে প্রতিশোধের জায়গায় অনুশোচনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। যেতে যেতে চিন্তা করল, এই বাবু যদি কায়সার হয়, তাহলে যেমন করে হোক আজকেই তার কাছে মাফ চেয়ে নেব। আবার ভাবল, সেদিন যা খারাপ ব্যবহার করেছি, সে কি মাফ করে আমাকে কাছে টেনে নেবে? এমন সময় তাবিয়া বলে উঠল, তোদের দু-জনের মহব্বতের কথা যদি হামে মালুম থাকত, তাহলে রবিউলের মায়ের কথায় ঐ কাম করতাম না। সাবিহা বলল, তোর কথায় আমি তা বুঝতে পেরেছি বলে কিছু বললাম না। নচেৎ এতক্ষণ তুই লাশ হয়ে যেতিস। দুজনে পাহাড়ে উঠার পর সাবিহা তাবিয়াকে বলল, তুই এখানে অপেক্ষা কর, আমি বাবুর কাছে গিয়ে দেখি, এই বাবু সেই বাবু কিনা।

তাবিয়া বলল, ঠিক হ্যায় তু যা।

সাবিহা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে দেখল, বাংলার নতুন স্যার ছবি আঁকছেন। সে আরো এগিয়ে এসে কাছাকাছি একটা গাছের আড়াল থেকে কিছুক্ষণ তাকে দেখল। তারপর কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, স্যার আপনি সেই টাউন থেকে এখানে ছবি আঁকতে এসেছেন?

কায়সার ছবি আঁকায় মশগুল ছিল বলে সাবিহার উপস্থিতি টের পাই নি। এতদিন পর এত কাছ থেকে প্রেয়সীর কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে আনমনা হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বলল, তুমি? তোমাকে কলেজে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এখানে এলে কি করে? সাবিহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্যারের মুখের দিকে চেয়ে চিনবার চেষ্টা করছিল। স্যারের কথা শুনে পূর্ব দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, আমাদের বাড়ী ঐ গ্রামে।

কায়সার তুলি রেখে বলল, বস একটু চা খাও।

সাবিহা কিছু না বলে আরো এগিয়ে এসে একটু দূরত্ব রেখে বসল।

কায়সার ফ্লাক্সের মুখে চা ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে বলল, এক্সটা আর কিছু নেই, তুমি আগে খেয়ে নাও, তারপর আমি খাব।

ঃ আপনি আগে খান।

ঃ দ্বিধা করছো কেন? তুমি ছাত্রী হলেও আমার মেহমান। মেহমানকে আগে খাওয়াতে হয়। তারপর ব্যাগ থেকে বিস্কুটের প্যাকেট বের করে বলল, বিস্কুট দিয়ে চা খাও। সাবিহা এতক্ষণ ফ্লাক্স ও ব্যাগ লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো কায়সারও ঠিক এই রকম ফ্লাক্স ও ব্যাগ ব্যবহার করতো। এখন বিস্কুটের প্যাকেট দেখে আরো অবাক হল। তখন তার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই বাবুজী।

তাকে চুপ করে ভাবতে দেখে কায়সার সাবিহার মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, কি

ব্যাপার খাচ্ছ না কেন? চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সাবিহা বলল, আপনি আগে খান তারপর আমি খাব।

কায়সার খেয়ে অল্প চা ঢেলে পাত্রটা ধুয়ে চা ঢেলে বলল, এবার খাও।

সাবিহা চা খেয়ে সাহস করে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

ঃ মনে করার কি আছে, কি জিজ্ঞেস করতে চাও কর।

ঃ আপনার কি চোখের কোনো ডিফেক্ট আছে? যার জন্য আপনি সব সময় রঙ্গিন চশমা পরে থাকেন।

ঃ না কোন ডিফেক্ট নেই। তবে এটা পরার অন্য কারণ আছে।

ঃ কারণটা বলবেন স্যার?

ঃ আজ বলতে পারবো না। সময় মত অন্য একদিন বলবো।

ঃ তাহলে চশমাটা একবার খুলুন।

কায়সার কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে চশমা খুলে তার দিকে চেয়ে রইল।

চশমা খুলতে সাবিহা তার চোখের দিকে চেয়ে চিন্তে পেরে চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে পলকহীনভাবে চেয়ে থেকে বাবুজী বলে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, আমাকে মাফ করে দিন বাবুজী। আমি বড় হতভাগী, পাপী। তাই আপনাকে সেদিন ভুল বুঝে ঐসব বলেছি। আপনাকে ঘৃণা করে রাগে ও দুঃখে আপনার কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেছি। ভুল বুঝে আপনাকে বারবার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি। আপনি মাফ না করলে আল্লাহও আমাকে মাফ করবে না। এখন আমাকে যত খুশী শাস্তি দিন। আপনার হাতে আমি শাস্তি পেতে চাই। তাবিয়ার মুখে আজ আপনার কথা শুনে আমার দীলে যে কি হচ্ছে, তা আল্লাহ পাককে মালুম। আপনি আমাকে কঠিন শাস্তি দিন। নচেৎ আমি দীল তাসাল্লি পাব না। আপনার যা মনে চায় সেই শাস্তি দিন।

কায়সার বলল, সেই আল্লাহ পাকের দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানাও, যিনি আমাকে আমার প্রিয়তমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার দুর্নাম থেকে রক্ষা করলেন। মানুষ অনেক সময় ভাগ্যের স্বীকার হয়। আমরা দু জনে তাই হয়েছিলাম। আল্লাহপাক তা থেকে মুক্তি দিলেন। সেই জন্যে তাঁর দরবারে আবার শতকোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি। তুমি সেদিন আমাকে ভুল বুঝে আমার কথা না শুনে চলে যেতে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, আমাদের প্রেম হয়তো খাঁটি নয়। তা না হলে সাবিহা আমাকে অবিশ্বাস করলো কি করে? খাঁটি প্রেমের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা নেই। একজনের সুখ-দুঃখ অন্যজন সমান ভাবে অনুভব করে। ভাগ্যক্রমে যদি তাদের মিলন না হয়, তা হলে তারা ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সারা জীবন তাকে মনে রেখে কাটিয়ে দেয়। দুজনের মধ্যে কারও একজনের যদি খাঁটি প্রেম না থাকে এবং তার প্রেমাস্পদকে ছেড়ে অন্য

কাউকে গ্রহণ করে, তাহলে ভাগ্যে নেই ভেবে সবুর করে। কিন্তু যদি কোন কারণে প্রেমাস্পদকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে, তাহলে ভাগ্যে নেই বলে মনকে প্রবোধ দিয়ে সবুর করে নিলেও সারা জীবন মনে ব্যথা অনুভব করে। এই জন্য মনীষীরা বলেছেন, যা কিছু দেখ বা শুন, তার তদন্ত করে দেখা উচিত। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছু বিশ্বাস করতে নেই। আমি জানি তুমি আমাকে গভীরভাবে ভালবাস। কিন্তু স্বল্প জ্ঞান বশত মাঝে মাঝে আমাকে ভুল বুঝে ফেল। এই এক বছর ধরে আমার কথা ভেবে ভেবে তুমি যা কষ্ট পেয়েছো তাও আমি জানি। আর আমি যে এতদিন কিভাবে কাটিয়েছি, তা আল্লাহ্ পাক জানেন।

সাবিহার তখনও চোখ থেকে পানি পড়ছিল। কায়সারের দুটো হাত ধরে বলল, এবার থামুন বাবুজী থামুন। আপনি যে কত মহৎ, কত উদার, তার প্রমাণ পেয়েছি। ভুল বুঝে আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছি তার শাস্তি পেতে চাই। দিন বাবুজী আমাকে শাস্তি দিন বলে মাথা নিচু করে নিল।

কায়সার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে তার চোখ-মুখ মুছে দিয়ে বলল, শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত। যা শাস্তি দেব, তা মেনে নিতে পারবে তো বলে তার চিবুক ধরে মুখটা তুলে ধরল।

সাবিহা বলল, নিশ্চয় পারব।

কায়সার বলল, এবার থেকে আর কোনদিন বাবুজী বলে ডাকতে পারবে না। আগের মতো নাম ধরে ডাকবে এবং আপনি করেও বলবে না।

সাবিহা মনে করেছিল, সে হয়তো তাকে জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ করে শাস্তি দেবে। কিন্তু তা না করে যে কথা বলল, তা তার উন্নত চরিত্রের কথা ভেবে ছল ছল নয়নে বলল, কায়সার সত্যিই তুমি মানুষ নও। কোন মানুষ এত সংযমী হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। জানতাম ফেরেস্তারা খুব সংযমী। তুমি সত্যিই মানুষ, না ফেরেস্তা?

কায়সার বলল, আল্লাহপাক মানুষকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষ আজ সৃষ্টি কর্তার হুকুম অমান্য করে অমানুষে পরিণত হয়েছে। ফেরেস্তারা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। আর তাদের তা করার ক্ষমতাও নেই। মানুষকে আল্লাহপাক সেই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সেই সংগে বিবেক দিয়ে দুনিয়াতে পাঠাবার আগে বলে দিলেন, তোমরা আমার হুকুম মেনে চলবে, নচেৎ দুনিয়াতে যেমন বিপদগ্রস্ত হবে তেমনি পরকালেও ভীষণ শাস্তি ভোগ করবে। মানুষ দুনিয়াতে এসে দুনিয়ার চাকচিক্যে মোহিত হয়ে তা ভোগ করার জন্য নিজেদের বিবেক

বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করে চলেছে। মেহেরবান আল্লাহ পাক তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অধঃপতন দেখে যুগে যুগে প্রতিটি দেশে নবী, রসুল, গৌউস, কুতুব, অলি, আবদাল পাঠিয়ে পথ ভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথে আনার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন, তারা কোন দিন আল্লাহ পাকের হুকুমের বরখেলাপ কোন কাজ করতে পারে না। যদি কখনও শয়তানের প্রবঞ্চনায় কোন পাপ করে ফেলে, তাহলে তৎক্ষণাত তওবা করে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।

তাবিয়া দূরে বনের আড়াল থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। তাদেরকে চা খেতে দেখে এগিয়ে এসে এতক্ষণ কাছাকাছি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। এবার সামনে এসে বলল, বাবু হামি তো অনেক গুণা করেছি, আল্লাহ কি হামাকে মাফ করবে? কায়সার বলল, নিশ্চয় করবেন। তুমি তওবা করে আল্লাহ পাকের কাছে কেঁদে কেঁদে মাফ চাও। তিনি রহমানুর রহিম। কেউ তার কাছে মাফ চেয়ে বিফল হয় না। যারা অন্যায় করে আর কখনও করবো না বলে ওয়াদা করে মাফ চায়, তাদেরকে তিনি মাফ করে দেন এবং ভালও বাসেন। তারপর কায়সার তাকে চা-বিস্কুট খেতে দিল। তাবিয়া বলল, না বাবু না খেতে পারবো না। আমি বহুৎ বড়া গোনাহ গার, হামাকে তোর ঘেন্না করছে না?

কায়সার বলল, আল্লাহ ও তার রসুল(সাঃ) পাপকে ঘৃণা করতে বলেছেন, পাপীকে নয়। সব মানুষই আল্লাহ পাকের বান্দা। ভাল-মন্দ সবাইকে তিনি রিজীক দেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোনো গোনাহগারকেই একটা নিঃশ্বাসও নিতে দিতেন না। তিনি অসীম দয়ালু। তাই গোনাহগাররাও স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে।

তাবিয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, তুই মানুষ না বাবু, তুই ফেরেস্তা তোর কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে। তারপর সে ছুটে সেখানে থেকে চলে গেল।

তাবিয়া চলে যাওয়ার পর সাবিহা বলল, আমি ক্ষমা পেয়েছি কিনা এখনও কিন্তু বলনি।

ঃ না বললেও কি বুঝতে পার নি?

ঃ পেরেছি।

ঃ তোমার মুখে শুনলে দীলে একটু শান্তি পাব বলে।

ঃ ক্ষমা তুমি পেয়েছো। এখন তোমাকে একটা ওয়াদা করতে হবে। কখনও কোন কারণে আমাকে ভুল বুঝবে না।

ঃ করলাম, তুমি দোয়া করো আল্লাহ পাক যেন আমাকে ওয়াদা পালন করার ক্ষমতা দেন।

ঃ আমিও করলাম। এবার একটু হাস তো। একবছর পর কলেজে তোমার চোখে ঘৃণা ও রাগ দেখেছি। আর আজ সেই থেকে কান্না মুখ দেখছি। এবার তোমার হাসি মুখ দেখতে চাই।

ঃ কায়সার তুমি নিশ্চয়ই জান, মনে হাসির উদ্রেক হলে তা মুখে ফুটে উঠে। আমার মন এখন অনুশোচনার আগুনে জ্বলছে। এই অবস্থায় হাসবো কি করে? তাছাড়া এই পাপ মুখে সেদিন কত কটু কথা তোমাকে বলেছি। সেই সব কথা মনে করে খুব সরমিন্দাও হচ্ছি। তুমিই বল, এখন আমি কি হাসতে পারি? তাবিয়ার কাছ থেকে সত্য ঘটনা শুনার পর এবং তোমার সংগে এতক্ষণ কথা বলে আমার মনে যেমন অনুশোচনার আগুন জ্বলছে তেমনি আনন্দের বান বইছে। তাই চোখের পানি দিয়ে মনের সেই অনুশোচনার আগুন নিভাবার চেষ্টা করছি এবং সেই আনন্দের বানের পানিতে ভেসে চলেছি। কথা শেষ করে সাবিহা দুহাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে লাগল। কায়সার তার হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে ধরে রেখে বলল, যখন হাসিমুখ দেখা ভাগ্যে নেই তখন কান্না ভেজা মুখটা দেখতে বাধা দিচ্ছ কেন? তারপর বলল, দুপুরে খাবার জন্য এক প্যাকেট বিরানী এনেছি। এসো দুজনে এক সংগে খাই।

সাবিহা বলল, তুমি খাও আমি বাড়ীতে গিয়ে খাব। একজনের খাবার দুজনে খেলে কারোরই পেট ভরবে না।

কায়সার বলল, ভরবে ভরবে। পেট না ভরলেও মনটাতো ভরবে। প্রতিদিন পেট ভরে খেয়েছি, আজ মন ভরে খাব। এসতো কোনো অজুহাত শুনবো না। পানির ক্যান থেকে পানি ঢেলে হাত ধুয়ে সাবিহাকেও ধুতে বলল, আর কোন পাত্র নেই, এই একপাত্রেই দুজনকে হাত লাগাতে হবে।

সাবিহার এক সংগে খেতে ইচ্ছা করলেও লজ্জা পেয়ে বলল, তুমি খেয়ে কিছুটা রেখে দিও, আমি পরে খাব।

কায়সার বলল, তা কথনও হতে পারে না। পানির ক্যানটা আড় করে বলল, নাও তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নাও।

সাবিহা হাত ধুয়ে এক পাত্রে খেতে লাগল। কায়সার একমুঠো ভাত নিয়ে সাবিহার মুখের কাছে ধরে বলল, তোমাকে খাইয়ে দিতে ইচেছ করছে।

সাবিহার লজ্জা পেলেও তার হাতটা ধরে মুখে ভাত নিয়ে খেয়ে বলল, আমারও তোমার মতো ইচ্ছে করছে।

কায়সার বলল, পাহাড় থেকে পড়ে আহত হয়ে যখন তোমাদের বাড়ীতে ছিলাম তখন তুমি আমাকে খাইয়ে দিতে। সেই সময় আমার যে কত আনন্দ হত তা

আল্লাহপাক জানেন। এখন যদি তাই কর তাহলে আরো আনন্দ পাব।

সাবিহা অবশিষ্ট ভাতগুলো তাকে খাইয়ে দিতে লাগল।

সাবিহা আর খাচ্ছে না দেখে কায়সার তার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে খাইয়ে দিতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সাবিহা বলল, আজকের মত আমাকে ছুটি দাও। এমনিতে অনেক দেরী হয়ে গেল। খাবার সময় মা-ভাবী আমাকে না দেখে কি মনে করছে কি জানি।

কায়সার বলল, কলেজ যে কয়দিন বন্ধ আছে সে কয়দিন আমি প্রতিদিন আসব। তুমিও নিশ্চয় আসবে?

ঃ আসবো, তবে দুপুরে খেয়ে-দেয়ে।

ঃ ঠিক আছে, তাই এসো। চল আমিও তোমার সংগে রওনা দিই। আজ আর ছবি আঁকব না।

পরের দিন দুজনে একই সময়ে এসে পৌছাল। সালাম বিনিময় করে সাবিহা বলল, প্রতিদিন বিশ মাইল করে চল্লিশ মাইল জার্নি করতে তোমার কষ্ট হয় না।

ঃ তোমার জন্য শুধু চল্লিশ মাইল কেন আরো অনেক মাইল জার্নি করতে পারি।

ঃ একটা কথা বলতে চাই?

ঃ বল।

ঃ সাহস হচ্ছে না যে?

ঃ আমি সাহস দিচ্ছি।

ঃ তবু পাচ্ছি না।

ঃ কেন?

ঃ কথাটা শুনে যদি কিছু মাইণ্ড কর।

ঃ করবো না।

ঃ তাহলে বলি?

ঃ বল।

ঃ খোদা না করুন এরপর যদি আমাদের মিলনের বাধা আসে, তাহলে কি করবে কিছু ভেবেছ?

ঃ প্রেমে তো বাধা আসবেই। যে প্রেমে বাধা নেই সে প্রেম যেমন খাঁটি নয় তেমনি সে প্রেমে সুখ-শান্তিও নেই।

ঃ তা আমিও জানি। কিন্তু গত রাত্রে একটা কথা ভেবে সারা রাত ঘুমোতে পারি

নি।

ঃ কি এমন কথা যা তোমাকে সারারাত ঘুমোতে দেয় নি।.আবার আমাকে বলতে সাহস পাচ্ছনা?

সাবিহা ছল ছল নয়নে বলল, তোমার আমার সম্পর্কের কথা একবার ভাইয়া জানতে পেরে ঐ রকম ঘটনা ঘটিয়েছে। আবার যদি জেনে গিয়ে কিছু করে?

কায়সার কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে মৃদু হেসে বলল, তুমি এই প্রবলেমের কিছু সলভ করতে পেরেছ?

সাবিহা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, না পারিনি?

কায়সার নিজের রুমালে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন ? আল্লাহ পাক ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তা হবেই। তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারও যখন নেই তখন আমরাও ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থেকে তাঁর কাছেই এই প্রবলেমের কিছু সলভ করার জন্য ফরিয়াদ করব। আমিও তোমার ভাইয়ার প্ল্যান সেদিনের ঘটনায় বুঝতে পেরেছি। তবে আমার কি মনে হয় জান, তোমার ভাইয়ার ম্যানেজার হাবিব গোয়েন্দাগিরী করছে।

সাবিহা চমকে উঠে বলল, তোমার কথা ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কারণ একদিন এখান থেকে ফেরার পথে আমাকে নিয়ে সে এদিকে বেড়াতে আসতে চেয়েছিল। আমি রাজী হইনি। সেই জন্যে সে হয় তো গোপনে আমাদেরকে ফলো করে ভাইয়াকে জানিয়েছে।

কায়সার বলল, আমারও তাই মনে হয় যাই হোক এনিয়ে বেশী চিন্তা না করে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চাও। তিনি সব কিছু করার মালিক। তাঁর হুকুম ছাড়া দ্যুলকে ও ভূলকে কিছুই হয় না। সাবিহা বলল, আরেকটা কথা বলতে চাই?

ঃ বল।

ঃ তুমি আর এখানে ছবি আঁকতে এসো না। কলেজ খোলার পর তো দেখা হবেই।

মৃদু হেসে কায়সার বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ। আমি কিন্তু আল্লাহ পাককে ছাড়া কাউকে ভয় করি না। ভাগ্যে যদি কিছু বিপদ থাকে তবে যতই সাবধান হই না কেন, হবেই এখানে আসতে যদি তোমার কোন অসুবিধে থাকে, তাহলে তুমি এসো না। তবে যে কদিন কলেজ বন্ধ থাকবে, সে কদিন আমি আসবই। কারণ এখানে এলে তুমি না থাকলেও তোমার খবর সবই পাই।

ঃ তুমি আমাকে এত ভালবাস?

ঃ কতটা ভালবাসি তা আল্লাহপাক জানেন।

ঃ এতদিন না দেখে ছিলে কি করে?

ঃ খুব কষ্টে ছিলাম। এই এক বছরের মধ্যে বেশ কয়েবার সিলেটে এসে কলেজের সামনের লাইব্রেরী থেকে আর্টের বই কিনেছি, আর তোমাকে এক নজর দেখার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। শেষে বহু চেষ্টা করে তোমাদের কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়েছি।

ঃ একটা জিনিস চাইবো দেবে?

ঃ তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই। বল কি চাও?

ঃ তোমার ঢাকার ঠিকানা।

কায়সার পকেট থেকে কাগজ-কলম নিয়ে ঠিকানা লিখে তার হাতে দিয়ে বলল, এটা মুখস্থ করে নিও। যদি কোন দিন তেমন কোন ঘটনা ঘটে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করতে না পার, তাহলে সোজা এই ঠিকানায় এসে আমার আব্বা-আম্মাকে তোমার-আমার সম্পর্কের কথা বলবে।

ঃ উনারা যদি আমাকে খারাপ মেয়ে ভেবে তাড়িয়ে দেন?

ঃ দেবেন না। আমি তাদেরকে তোমার সেই ফটোটা দিয়ে আমাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা বলেছি।

আরো কিছুক্ষণ থেকে সাবিহা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সাবিহাকে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ কায়সার সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর অদৃশ্য হয়ে যেতে ছবি আঁকায় মন দিল।

কলেজ পঁচিশ দিন বন্ধ। কায়সার প্রতিদিন ঐ পাহাড়ে ছবি আঁকতে আসে। কিন্তু সাবিহার ভাইয়া জানতে পারলে কায়সারের বিপদ হবে মনে করে প্রতিদিন আসে না। যেদিন ভাইয়া বাড়ীতে থাকে না সেদিন আসে।

তিন সপ্তাহ পর হাবিব মাল ডেলিভারী দিয়ে জৈন্তাপুরে ফিরে এল। বিকেলে সাবিহাকে পাহাড়ের দিক থেকে আসতে দেখে হাবিব ভাবল, আজ আবার এদিক থেকে আসছে কেন? মুখের দিকে চেয়ে সন্দেহ হল আগের থেকে অনেক প্রফুল্ল। আজ এক বছরের মধ্যে সাবিহার সঙ্গে হাবিবের অনেক বার দেখা হয়েছে। দেখা হলেই সাবিহা ঘৃণা ভরে তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত সরে গেছে। হাবিব তাকে মাঝে মাঝে নির্জন জায়গায় বসে কাঁদতে দেখেছে। হাবিব লক্ষ্য করেছে, কায়সারকে মারধর করে তাড়াবার পর সাবিহা খুব মুষড়ে পড়েছিল। ক্রমশ স্বাভাবিক হলেও সে আর কোন দিন ঐ পাহাড়ের দিকে যায় নি। তা হলে কায়সার কি আবার এখানে আসতে শুরু করেছে?

যদি তাই হয়, তাহলে তো খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।

অফিসের কাজে বেশ কিছু দিন হাবিবকে থাকতে হচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাবিহার দিকে লক্ষ্য রাখল। তিন-চার দিন পর তাকে বেলা দুটোর দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে যেতে দেখে হাবিব তার পিছু নিল। সে যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। প্রথমে হাবিব কায়সারকে চিনতে পারল না। সাবিহা তার কাছে গিয়ে যখন গল্প করতে লাগল তখন সে অল্প দূরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে কায়সারকে চিনতে পারল এবং জানতে পারল, সে সিলেট মহিলা কলেজে প্রফেসারী করছে।

সাবিহা সেদিন বেশীক্ষণ থাকল না। ভাইয়া ও হাবিবের চোখে ফাঁকি দিয়ে এসেছে বলে তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

কথাটা শুনে হাবিবের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। যখন দেখল, সাবিহা অনেক দূর চলে গেছে তখন সে কায়সারের সামনে এসে বলল, কি কায়সার সাহেব, ছবি আঁকার খায়েশ তাহলে আপনার এখানো মিটে নি? সেই সঙ্গে বেশ বদল করে প্রেমের খেলাও চালিয়ে যাচ্ছেন?

কায়সার ছবি আঁকছিল। হাবিবের কথা শুনে তুলিটা রেখে ঘুরে বলল, যা করছি তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

ঃ তা অবশ্য পাচ্ছি। কিন্তু আপনার সাহস দেখে খুব অবাক হচ্ছি। গোদন মৃত্যুর হাত থেকে ভাগ্যচক্রে রক্ষা পেলেও আজ আর পাচ্ছেন না। ছবি আঁকতে আসেন, না পাহাড়ী মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করতে আসেন?

কায়সার রেগে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, সেটাও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন?

ঃ পেয়েছি বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ প্রমাণ দিতে পারবেন?

ঃ প্রমাণ আর দেব কি? সাবিহাকে একটু আগে আপনার সঙ্গে গল্প করতে দেখলাম। তারপরও প্রমাণ দিতে বলেন?

ঃ সাবিহা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ফুর্তি করতে নয়। সেটা নিশ্চয়ই দেখেছেন?

ঃ তাহলে কেন এসেছিল সে?

ঃ আমরা দুজন দুজনকে ভালবাসি। আর ভালবাসা পাপ নয়।

ঃ বাহ্ বেশ সুন্দর কথা বললেন। তবে এটা নাটকের মঞ্চ নয়, কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল।

ঃ উচিত অনুচিত আপনার কাছে শুনতে চাই না। আপনি কে? এত যে কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন?

ঃ আমি কে তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। যার নুন খাই, তার ক্ষতি হতে দেখলে প্রতিরোধ করা কর্তব্য মনে করি।

ঃ আপনার কথা অবশ্য ঠিক। তবে আমি এমন কোন কাজ করি নি, যা আপনার মালিকের ক্ষতির কারণ হচ্ছে!

ঃ আলবৎ হচ্ছে। যদি ক্ষতি না হবে, তাহলে বছর খানেক আগে ঐ ঘটনা ঘটল কেন?

একেই সেই ঘটনায় হাবিব পরোক্ষভাবে দায়ী জেনে কায়সার তার উপর রেগেছিল। এখন সেই কথা শুনে খুব রেগে গিয়ে বলল, তার পিছনে আপনার মত ক্রুর ও পরশ্রীকাতর লোকের দুরভীসন্ধি ছিল।

হাবিবও খুব রেগে গেছে । ঠোঁটে ঠোঁটে কামড়ে বলল, আমি ক্রুর, পর শ্রীকাতর? আর আপনি খুব সাধু। মনে রাখবেন, আমি সাবিহাকে বিয়ে করব। আর আপনি একটা মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করে আবার সাবিহার পিছনে লেগেছেন। জানেন আপনাকে এখন প্রাণে শেষ করে দিতে পারি? কায়সার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল, শেষ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আপনি শেষ করার কে?

কে তাই দেখাচ্ছি বলে হাবিব তার মুখে ঘুঁসি মারতে গেল। কায়সার তার হাতটা ধরে মুচড়ে দিয়ে বলল, সত্যি সত্যি আমাকে মেরে ফেলতে চান? তা হলে শুনুন আল্লাহ যদি আপনার হাতে আমার মৃত্যু লিখে রাখেন, তাহলে মরব।

নচেৎ আপনার মত কয়েকজন হাবিবও আমাকে মেরে ফেলতে পারবে না।

হাবিব শক্তিশালী যুবক। পৌনে ছয় ফুট লম্বা, ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতি, বলিষ্ঠ চেহারা। তার গ্রামের সমবয়সী ছেলেরা সমীহ করে চলে। কায়সার ঘুঁসি ব্যর্থ করে তার হাত মুচড়ে দিতে আরো রেগে গিয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালাল।

কায়সার তার সব আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়ে সুযোগ মত কংফু ও ক্যারাতের মার মারতে লাগল। যখন হাবিব মার খেয়ে পড়ে গিয়ে উঠতে পারল না এবং তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল তখন কায়সার ক্ষ্যান্ত দিয়ে বলল, আরো লড়বেন, না আজকের মত থাকবে?

হাবিবের অবস্থা তখন গুরুতর। সে ভাবতেই পারছে না, ঐ একহারা রোগা পাতলা কায়সার কি করে এত শক্তি রাখে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এর প্রতিশোধ তুলে ছাড়বো তবে আমার নাম হাবিব।

কায়সার স্মীত হাস্যে বলল, আপনি তো আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন, এখন যদি আমি আপনাকে মেরে ফেলি, তাহলে প্রতিশোধ নেবেন কি করে? আবার বলল, ভয় নেই, তা আমি করব না। আল্লাহ পাক একমাত্র প্রাণ নেবার মালিক। কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করলে, তাকে তিনি ক্ষমা করনে না। তাই আপনি আজ বেঁচে গেলেন।

হাবিব উঠে দাঁড়িয়ে নাক-মুখের রক্ত মুছে বলল, কায়সার সাহেব কাজটা ভাল করলেন না। এর প্রতিফল আপনাকে পেতে হবে। কথা শেষ করে সে টলতে টলতে চলে গেল।

কায়সারও ব্যাগ ও ফ্লাক্স নিয়ে নিজের পথে রওয়ানা দিল।

নবম

হাবিব সেদিন অফিসে না গিয়ে শ্রীমঙ্গলে নিজেদের বাড়ীতে এল। তার বাবা আজরাফ ছেলের অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, তোর এরকম হল কি করে?

হাবিব বলল, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

আজরাফ ডাক্তার নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে লাগল।

ঐদিন হাবিবকে না দেখে আদিল খুব চিন্তিত হল। পরের দিন কথাটা বাবাকে জানাল।

দেলওয়ার সর্দার বললেন, কোন কারণে সে হয়তো বাড়ী গেছে। দু-এক দিন অপেক্ষা করে দেখ। তারপর না হয় শ্রীমঙ্গলে গিয়ে খোঁজ নিবে।

তিন-চার দিন হয়ে যেতেও হাবিব যখন এল না তখন আদিল শ্রীমঙ্গলে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করে হাবিবের কথা জিজ্ঞেস করল।

আজরাফ বলল, সেতো পাহাড় থেকে পড়ে আহত হয়েছিল। ডাক্তার চিকিৎসা করছে। এখন একটু ভাল আছে।

আদিল হাবিবের সঙ্গে দেখা করে আসল ঘটনা শুনে খুব রেগে গেল। সুস্থ হয়ে তাকে আসতে বলে ফেরার সময় চিন্তা করল, সাবিহা নিশ্চয় তার প্ল্যানের কথা জেনে গেছে। তা না হলে সে আবার কায়সার বাবুর সঙ্গে মেলামেশা করছে কি করে? আরো চিন্তা করল, হাবিব সাবিহার সব কিছু লক্ষ্য রাখছে কেন? তা হলে সেও কি সাবিহাকে চায়? যদি তাই হয়, তবে কাঁটা তুলতে হবে। প্রথমে হাবিবকে দিয়ে কায়সার বাবুকে সরাতে হবে। পরে হাবিবকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেই হবে। বাড়ীতে এসে আদিল লুবাবাকে জিজ্ঞেস করল, সাবিহার কিছু খবর জান?

লুবাবা বলল, তার আবার খবর কি?

আদিল কায়সার ও সাবিহার মেলামেশার কথা এবং হাবিব ও কায়সারের মারামারির কথা বলল।

ঃ তাহলে তো খুব চিন্তার কথা ?

ঃ হ্যাঁ খুবই চিন্তার কথা। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সাবিহার তকদ্বীরে কি আছে জানি না, তবে কায়সার বাবু ও হাবিবকে এখান থেকে ভাগাতে হবে।

ঃ হাবিব আবার কি করল?

ঃ বুঝতে পারছ না কেন? হাবিবও সাবিহার উপর চোখ ফেলেছে।

ঃ তার চেয়ে এক কাজ কর, বাবাকে বলে সাবিহার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

ঃ বাবাকে তো আর এসব কথা বলা যাবে না। তবে বিয়ের কথা বলতে হবে।

সেদিন রাতে আদিল বাবার কাছে সাবিহার বিয়ের ব্যাপারে কথা তুলল। দেলওয়ার সর্দার বললেন, ও বি. এ.-টা পাস করুক, তারপর বিয়ে দেব।

ঃ কিন্তু বাবা, তুমি যে ওকে এত লেখাপড়া করাচ্ছ, ওর উপযুক্ত ছেলে কি আমাদের গোত্রের মধ্যে আছে?

ঃ নেই তা আমি জানি। ওকে যে কেন এত লেখাপড়া করাচ্ছি, তা ওর বিয়ে দেবার সময় বলব। ওর ব্যাপার নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বাবার কথা শুনে আদিল খুশী হতে পারল না। নিজের রুমে এসে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে কায়সার বাবুকে একেবারে মেরে না ফেলে এখান থেকে ভাগান যায়। শেষে ভেবে ঠিক করল, হাবিব আসার পর তার সাথে যুক্তি করে তাকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে। তবে খুব সাবধানে, সাবিহা যেন টের না পায়, আমি হাবিবের সঙ্গে আছি।

দশ দিন পর হাবিব সুস্থ হয়ে জৈন্তাপুরে ফিরে এল। একদিন আদিল তাকে বলল, সেবার আপনি সাবিহা ও কায়সারের কথা বলে অনেক উপকার করেছিলেন। আবার এবারও আমাদের ভাল চিন্তা করে তাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছেন। তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা নিশ্চয় আপনার আছে?

হাবিব বলল, সে কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। যা করার আমি তা মনে মনে ভেবে ঠিক করে রেখেছি। সেবার আপনি ওকে বঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এবার আর বাছাধনকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে না।

আদিল বলল, সাবাস এই তো মরদের মত কথা বলেছেন। যা করবেন বলে ভেবেছেন তাতে যদি টাকা-পয়সা লাগে বলবেন, আমি দেব। আর এমন ভাবে কাজটা

করবেন, সাবিহা আমাকে বা আপনাকে যেন সন্দেহ করতে না পারে। হাবিব বলল, টাকা-পয়সা লাগলে তখন দেখা যাবে। আর জানা-জানির কথা বলছেন? এমনভাবে কাজ সারবো, সালুটিকুর ও জৈন্তাপুরের কোন মানুষ জানতেই পারবে না।

আদিল তার কাঁধ চাপড়ে বলল, একেই তো বলে সাচ্ছা মরদ। কলেজ খোলার আগের দিন সাবিহা হোস্টেলে ফিরে এল। তার রুমমেট অলকা আগেই এসেছে। সাবিহা ব্যাগটা খাটের উপর রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কিরে কেমন আছিস? অলকা হিন্দু কায়স্থ ঘরের মেয়ে। দেখতে খুব সুন্দরী না হলেও সুন্দরী। টান টানা চোখ। গোলগাল মুখ। দোহারা শরীর। সাড়ে পাঁচ ফুটের মত লম্বা। শ্যামলা রং। পড়াশুনায় মোটামোটি ভাল। খুব বাচাল। কলেজের অনেক ছেলেকে নাচায়। খুব ফরওয়ার্ড মেয়ে। হৈ হুল্লোড় করতে খুব ভালবাসে।

সাবিহা অলকার চেয়ে সব দিক থেকে অনেক বেশী সুন্দরী। সে খুব চঞ্চল ও হাসি-খুশি মেয়ে। কিন্তু অলকার মত বাচাল বা ফরওয়ার্ড নয়। দুজনের খুব মিলমিশ ছিল। এইচ. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে সাবিহা বাড়ীতে গিয়ে কায়সারের সঙ্গে ঐ ঘটনা ঘটে যাবার পর সে বেশ গম্ভীর হয়ে যায় সব সময় মন ভার করে থাকে। ওরা যখন বি. এ. ফাস্ট ইয়ারে তখন একরাতে সাবিহার কান্না শুনে অলকার ঘুম ভেঙ্গে যায়। লাইট জ্বেলে দেখল, সাবিহা খাটে বসে দুঁহাটুতে মুখ গুজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। অলকা তার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলল, কিরে কাঁদছিস কেন? স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিস না কি?

সাবিহা সামলে নিয়ে বলল, না।

ঃ তবে কাঁদছিস কেন?

সাবিহা কায়সারের সঙ্গে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা সব বলে বলল, জানিস, সে খারাপ জেনেও তাকে ভুলতে পারছি না। তার স্মৃতি মন থেকে মুছতে পারছি না।

শুনে অলকা বলল, শতকরা নিরানব্বই জন ছেলে ঐ রকম হয়। সে যেমন বেঈমানি করেছে, তেমনি শাস্তিও পেয়েছে। তার কথা একদম ভুলে যাওয়া তোর উচিত। এরপর সাবিহা কিছুটা পূর্ব জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টা করে সফল হলেও মাঝে মাঝে মন খারাপ করে থাকে। ইদানীং অলকা লক্ষ্য করেছে, বাংলার নতুন প্রফেসারকে দেখে সাবিহা যেন আবার বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। তেমন হাসি খুশি ভাব নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে, শরীর ভাল নেই। তার কথা অলকার বিশ্বাস হয় না। অলকার কেন যেন বারবার মনে হয়, সাবিহা বাংলার নতুন প্রফেসারকে নিয়ে ভাবে। একদিন সে কথা

জিজ্ঞেসও করেছিল। শুনে সাবিহা রেগে গিয়ে বলেছিল, তুই ভীষণ বাচাল, এব্যাপারে আর কোন কথা বলবি না।

আজ সাবিহাকে বাড়ী থেকে ফিরে আগের মত হাসি খুশী হয়ে জড়িয়ে ধরতে বেশ অবাক হয়ে বলল, আমি তো ভাল আছি কিন্তু তোকে দেখে মনে হচ্ছে, তুই খুব বেশী ভাল আছিস।

সাবিহা তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠিক বলেছিস।

ঃ তা হলে নতুন কিছু ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছে?

ঃ তোর অনুমান ঠিক। সবুর কর, আমি হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়টা পাল্টে নিই। তুই ততক্ষণ কিচেনে গিয়ে আয়াকে দুকাপ চায়ের কথা বলে আয়।

অলকা বেরিয়ে একটু পরে নিজের হাতে দু কাপ চা নিয়ে এসে একটা সাবিহার হাতে দিয়ে বলল, নে শুরু কর তোর নতুন ঘটনা।

সাবিহা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, নতুন ব্যাপার কিছু হয় নি। পুরোনো ব্যাপারটা নতুনভাবে ফিরে পেলাম।

ঃ ব্যাপারটা খুলে না বললে বুঝবো কি করে?

ঃ বলছি শোন, তারপর বাংলার নতুন প্রফেসারকে দেখে কেন তার মন খারাপ হয়েছিল এবং এবারে বাড়ীতে গিয়ে কিভাবে তার ভুল ভাঙ্গল, তারপর কি করে পূর্ব প্রেমিক বাংলার নতুন প্রফেসারের সঙ্গে পুনর্মিলন হল, তা সব বলে বলল, জানিস তার কাছে মাফ চেয়ে নিয়েও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছি।

অলকা বলল, তোকে কায়সার স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে যা বলেছিলি, তা আমি বিশ্বাস করি নি। যা আন্দাজ করেছিলাম, ঠিক তাই হল। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে। গত বছর মাঝে মাঝে কলেজ গেটের অপজিটের লাইব্রেরীতে কায়সার স্যারকে দেখে আমরা কত খারাপ মন্তব্য করেছি।

সাবিহা বলল, হ্যাঁ মনে আছে। কলেজে স্যারকে দেখে ভেবেছিলাম, যদি ইনি সেই কায়সার হয়, তাহলে বিট্রে করার প্রতিশোধ নেব। আর এখন সে সব কথা মনে হলে শরমে মরে যাই অনুশোচনায় পুড়ে ছাই হয়ে যাই।

অলকা বলল, তোদের প্রেম খাঁটি। তাই মানুষ কৌশলে তোদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেও তোদের মিলন হল।

সাবিহা আঁশুভরা চোখে বলল, আল্লাহ পাকের কাজ, আল্লাহ পাক করেন। সেখানে মানুষ বাধা দিয়ে কিছু করতে পারে না। পরের দিন কলেজ ছুটির পর সাবিহা কায়সারের সঙ্গে দেখা করলে, কায়সার তাকে বলল, আমি প্রতিদিন বিকেলে কলেজের

পিছনের পাহাড়ে ছবি আঁকি। তুমি ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করো। একটা কার্ড তার হাতে দিয়ে বলল, এটা বাসার ঠিকানা। এখানেও আসতে পার।

সাবিহা সালাম বিনিময় করে ফিরে এল। অলকা গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করল, কিরে স্যার কি বললেন?

ঃ পাহাড়ের পিছনে অথবা বাসায় যেতে বলল।

ঃ আমাকে সঙ্গে নিবি?

ঃ নেব, তবে তার আগে ওর অনুমতি নিতে হবে।

ঃ তাই নিস, এখন চল।

কয়েক দিন পর সাবিহা কায়সারকে অলকার কথা বলে অনুমতি নিয়ে এক ছুটির দিন সকালে অলকাকে সঙ্গে নিয়ে কায়সারের বাসায় এল।

ঃ সালাম বিনিময়ের পর কায়সারের সঙ্গে অলকার পরিচয় করিয়ে দিল। চা-নাস্তা খাবার সময় সাবিহা বলল, আজ আমরা রান্না করে তোমাকে খাওয়াব।

কায়সার বলল, তাহলে তো আমার সৌভাগ্য। কাজের মেয়ের হাতে একই ধরনের রান্না খেয়ে খেয়ে এক ঘেয়েমি লেগে গেছে। তারপর কাজের মেয়েকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, ওরা কি বাজার করতে বলে নিয়ে এস। আজ তোমাকে রান্না করতে হবে না, এরা করবে।

সেদিন রান্না করে দুপুরে খেয়ে-দেয়ে সন্ধ্যের আগে সাবিহা ও অলকা হোস্টেলে ফিরে এল। সাবিহা প্রতিদিন না হলেও দু-একদিন অন্তর পাহাড়ে কায়সারের সঙ্গে দেখা করে। মাঝে মাঝে অলকাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাসায় গিয়ে রান্না করে আনন্দ করে খেয়ে-দেয়ে আসে। এভাবে দীর্ঘ এক বছর পর সাবিহা বি. এ. পরীক্ষা দিল। যেদিন পরীক্ষা শেষ হল, তার পরের দিন সাবিহা কায়সারের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করল, এখন তো কলেজ বন্ধ, তুমি নিশ্চয় বাড়ী যাবে?

ঃ না।

ঃ কেন?

ঃ ঠিক করেছি একেবারে যাব।

ঃ বুঝলাম না।

ঃ তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। তাই ভেবে ঠিক করেছি, তোমাকে বিয়ে করে অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে একেবারে দুজনে একসঙ্গে যাব। বিয়ের কথা শুনে সাবিহা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে নিল। কায়সার তার চিবুক ধরে তুলে চোখে চোখে রেখে বলল, কিছু বলছ না যে?

সাবিহা তার চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না। চোখ বন্ধ করে বলল, আমার লজ্জা করে না বুঝি? যাও কিছু বলতে পারব না। তারপর হাতটা সরিয়ে দিয়ে অশ্রু সজল নয়নে বলল, কি ভাবে করবে কিছু ভেবেছ?

কায়সার তার মুখে ভয়ের ছাপ দেখতে পেয়ে বলল, তুমি ভয়পাচ্ছ কেন? আল্লাহ পাক রাজী থাকলে, তিনিই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

সাবিহা ভিজে গলায় বলল, ভাইয়া জানতে পেরে প্রথমে যা করেছিল, সে কথা মনে হলে কলজে শুকিয়ে যায়। এখন আবার যদি জানতে পারে, তা হলে কি করবে ভেবে ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ি।

কায়সার তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, এই ভীতু মেয়ে কাঁদছ কেন? আল্লাহ পাকের কাছে মনের বাসনা জানিয়ে সাহায্য চাও।

ঃ তাতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর চাই। কিন্তু মন যে মানে না।

ঃ তকদ্বীরের কথা স্মরণ করে মনকে মানাবার চেষ্টা কর।

ঃ তুমি এই ছুটিতে জৈন্তাপুরে ছবি আঁকতে যাবে?

ঃ যাব। কারণ তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।

ঃ কিন্তু আমার যে খুব ভয় করছে।

ঃ তুমি আমাকে খুব ভালবাস। তাই আমার বিপদের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ। তুমি ভয় পাও আর যাই পাও, আমি কিন্তু প্রতিদিন যাব।

সাবিহা চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, প্রতিদিন যেও না। সপ্তাহে একদিন যেও। সে দিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।

কায়সার তার চোখের পানি মুছে দেবার সময় বলল, তুমি ভয় পেয়ে এত কাঁদছ কেন? বললাম না, আল্লাহ পাকের ঈশারা ছাড়া কোন কিছু হয় না। তিনি সহায় থাকলে কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না।

সাবিহা বলল, আমার কথা রাখবে না?

ঃ রাখব।

ঃ তা হলে সপ্তাহে একদিন যাবে বল?

ঃ বেশ তাই।

ঃ কি বারে কখন যাবে?

ঃ সোমবার বেলা দশটার দিকে। তুমি আসবে তো?

ঃ ইনশাল্লাহ আসবো। তারপর সালাম বিনিময় করে হোস্টেলে ফিরে এল।

রাতে ব্যাগে কাপড়-চোপড় গোছাবার সময় অলকা জিজ্ঞেস করল, কিরে বিকেলে

স্যারের সঙ্গে কি এত কথা হল?

কায়সারের সঙ্গে যা কিছু কথা হয়েছে সাবিহা সব বলল।

অলকা বলল, ঈশ্বরকে জানাই, তিনি যেন তোমাদের মনস্কামনা তাড়াতাড়ি পূরণ করেন।

সাবিহা বাড়ীতে এসে দেখল, হাবিব রয়েছে। চার দিন পর সোমবারে বেলা দশটার দিকে সংগোপনে সাবিহা পাহাড়ে রওয়ানা দিল।

হাবিব সপ্তাহ খানেক হল মাল ডেলিভারী দিয়ে ফিরে এসেছে। সে যে ঢাকার একজন খুব বড় ব্যবসায়ীর এক ছেলে হয়েও সাবিহার জন্য ব্যবসা-পত্র না দেখে সিলেটে প্রফেসারী করছে, তা জেনে হাবিব কায়সারের প্রতি আরো বেশী রেগে আছে। ভেবেছে দেলওয়ার সর্দার তার মেয়েকে শিক্ষিত করছে, শহরে বড় লোকের উপযুক্ত ছেলের সাথে বিয়ে দেবে বলে। যদি কায়সারের পরিচয় পায়, তা হলে হয় তো তারই সাথে বিয়ে দিতে অরাজী হবে না। যা করার তার আগেই করতে হবে। এবারে সাবিহা বাড়ীতে এলে তার দিকে হাবিব ভালভাবে নজর রাখল। এই কদিন তাকে কোথাও যেতে না দেখে অবাক হয়েছিল। আজ তাকে ঐ পাহাড়ী রাস্তার দিকে যেতে দেখে হাবিব তার পিছু নিল। সেখানে পৌঁছে সাবিহা ও কায়সারের কথাবার্তা শোনার জন্য অল্প দূরে বনের আড়ালে দাঁড়াল।

কায়সার তখন সাবিহাকে বলছে, জান সাবিহা, আমি আব্বা-আম্মাকে তোমার সব কিছু জানিয়ে হিমুকে নিয়ে আসতে বলেছি। সাবিহা তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল হিমু আবার কে ? কায়সার বলল, একবার তোমাকে বলেছিলাম না, আমার একটা বোন আছে? তার নাম হিমু। ওটা ডাক নাম। ভাল নাম হোমায়রা। তারপর শোন, তারা এলে আমি তাদেরকে তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে প্রস্তাব দেওয়াব।

কথাটা শুনে হাবিব চমকে উঠল। চিন্তা করল, আমার কথাই ঠিক। এরকম সম্বন্ধ পেলে দেলওয়ার সর্দার হাত ছাড়া করবে না। নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা করে রাগে তার চোয়ালটা আপনা থেকে শক্ত হয়ে উঠল। আরো কি কথা হয় শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

কায়সার বলল, আল্লাহ পাক তাঁর কোন বান্দার নেক মকসুদ অপূরণ রাখেন না। তোমাকে আজ আর দেরী করাবো না। তুমি যাও। আমি আরো কিছুক্ষণ ছবি আঁকবো। তারপর বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলল, সামনের সোমবারে আসবে তো?

সাবিহা আসবো বলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বেশীক্ষণ ছবি এঁকো না।

কায়সার মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে তাই হবে। সাবিহা চলে যাবার পর সে ছবি

আঁকতে লাগল।

হাবিব ফেরার পথে প্লান প্রোগ্রাম ঠিক করে ভাবল, যে সময়ে তার লোকেরা কায়সারকে খুন করবে, সেই সময় কায়সারের মত পোশাক পরে সে ঐ পাহাড়ে এসে যা করবে তা ভেবে হাবিবের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। ঐদিন রাতে হাবিব আদিলকে বলল, আমি কাল বাড়ী যাব। ফিরতে আট-দশ দিন দেরী হবে।

আদিল জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

ঃ ব্যাপার কিছু আছে। তারপর কায়সারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার প্ল্যানটা বলল।

কথাটা শুনে আদিলের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অত সুন্দর বাবুকে খুন করতে তার মন সায় দিল না। বলল, দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে দিলে পরে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তার চেয়ে এমন ব্যবস্থা করুন, যাতে করে সে আর যেন সিলেটে ফিরে না আসে। শুধু শুধু খুনের দায়ে দায়ী হবেন কেন? হাবিবকে চুপ করে ভাবতে দেখে আবার বলল, যাদেরকে দিয়ে কাজটা করাবেন তাদেরকে টাকা দিতে হবে মনে হয়?

ঃ তা তো দিতেই হবে।

ঃ কত লাগতে পারে?

ঃ এখন হাজার পাঁচেক দেন। আরো যদি লাগে পরে দিলে চলবে। আদিল তাকে টাকাটা দিয়ে বলল, যা বললাম কথাটা মনে রাখবেন।

হাবিব কিছু না বলে টাকাটা নিজের ব্রীফকেসে রেখে দিল। এদিকে শামসুল আলম সাহেব ছেলের চিঠি পেয়ে স্ত্রীকেও পড়ে শোনালেন।

আকলিমা বেগম বললেন, কি করবে ভেবেছ?

ঃ কি আর ভাববো? ছেলে যখন ঐ মেয়েকে ছাড়া অন্য মেয়েকে বিয়ে করবে না তখন আমরা বাধা দিয়ে কি করবো। ওর তকদ্বীরে যা আছে তা হবেই।

ঃ কায়সার তো আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে।

ঃ তাতো যাবো। তবে তার আগে মেয়ের বাবাকে একটা চিঠি দিয়ে জানাতে হবে।

ঃ তাই জানাও।

শামসুল আলম সাহেব ছেলের চিঠিতে পাঠান জৈন্তাপুরের ঠিকানায় দেলওয়ার সর্দারকে যাবার দিন তারিখ জানিয়ে বিস্তারিত সকল কিছু লিখে পত্র দিলেন।

দেলওয়ার সর্দার চিঠি পেয়ে চিন্তা করলেন, এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এত সুন্দর সম্বন্ধ হাত ছাড়া করবেন না। চিঠির মধ্যে পাঠান ছেলের ফটো দেখে

কায়সারকে চিনতে পেরে খুব খুশী হয়ে ভাবলেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তাই হয়তো এত বড় লোকের ছেলে সালুটিকুরের পোস্ট মাস্টার হয়ে এসেছিল। তিনি শুনেছেন কায়সার বাবু বছর খানেক আগে রিজাইন দিয়ে চলে গেছেন। এখন আবার পত্রে তাকে সিলেটের মহিলা কলেজে প্রফেসারী করছে জেনে মনে মনে আল্লাহ পাককে জানালেন, তিন যেন এই সম্বন্ধ কবুল করেন। তিনিও পত্রের উত্তরে স্বাগত জানালেন। সেই সঙ্গে সাবিহার আসল বাবা মাকে তার বিয়ের আগে আসবার জন্য নির্দিষ্ট দিন তারিখ দিয়ে পত্র লিখলেন—

জাব্বার সাহেব,

এই পত্র পড়ে আপনি যেমন আনন্দিত হবেন তেমনি আমার উপর খুব রেগেও যাবেন। যাই করেন না কেন, ষোল-সতের বছর আগে আপনার হারান মেয়েকে যদি ফিরে পেতে চান, তাহলে পত্র পাওয়ার মাত্র নির্দিষ্ট দিনে এসে পৌছাবেন। সেই সময় বিস্তারিত সব কিছু জানাব। আপনারা অন্য কিছু ভাবতে পারেন মনে করে এই সঙ্গে খবরের কাগজে হারানো বিজ্ঞপ্তি থেকে নেয়া মেয়ের ফটোর ফটো কপি এবং এখনকার ফটো পাঠালাম। আমি আপনাদের কাছে এতদিন মেয়ে ফেরৎ না দিয়ে মস্ত বড় গোনাহর কাজ করেছি। সেই গোনাহ থেকে রেহাই পেতে চাই। তাই আপনাদের জিনিস আপনাদেরকে ফেরৎ দিয়ে অনুশোচনার আগুন থেকে মুক্তি পেতে চাই। বেশী কিছু লিখলাম না। আশা করি আপনারা যথাসময়ে এসে আমাকে আমার অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেবেন।

ইতি–

জাব্বার সাহেব বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এলে স্ত্রী আতিয়া বেগম চা-নাস্তা খাওয়াবার সময় একটা রেজিস্ট্রী চিঠি স্বামীর হাতে দিয়ে বললেন, আমি সই করে রেখেছি। চিঠিতে কি আছে দেখতো এত ভারী কেন? রেজিস্ট্রী চিঠি বলে খুলি নি।

জাব্বার সাহেব চিঠিটা খুলে ফটো দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। তারপর ফটো দুটোর দিকে চেয়ে চোখের পানি রোধ করতে পারলেন না।

স্বামীর অবস্থা দেখে আতিয়া বেগম আতংকিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার? কার ফটো দেখি। তারপর স্বামীর হাত থেকে ফটো দুটো নিয়ে তিনিও চমকে উঠে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, এতো আমার আঁতড়ীছেড়া ধন ডালিয়ার জমজ বোন রাফিয়া।

ফটো দুটোয় পাগলের মত চুমো খেতে খেতে বললেন, চিঠিতে কি লেখা আছে শিগ্রী পড়।

জাব্বার সাহেব চিঠিটা জোরে জোরে পড়লেন।

চিঠি পড়া শেষ হতে আতিয়া বেগম স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

জাব্বার সাহেবের চোখ দিয়েও পানি পড়ছিল। চোখ মুছে স্ত্রীকে প্রবোধ দিতে দিতে বললেন, অত ভেঙ্গে পড়ছ কেন? আজ ষোল-সতের বছর পর আল্লাহ পাক আমাদের হারান নিধির খোঁজ দিলেন। তাঁকেই জানাও, আমরা যেন ভালই ভালই রাফিয়াকে নিয়ে আসতে পারি। চল, শোকরানার নামায পড়ে সেই দোওয়া করি।

আজ এতদিন পরে হারানো মেয়ের খবর পেয়ে আতিয়া বেগম আনন্দে আপ্লুত হয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসাতে ভাসাতে শোকরানার নামায পড়ে স্বামীকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা কর।

এমন সময় ডালিয়া কলেজ থেকে ফিরে আব্বা-আম্মার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার তোমরা কাঁদছ কেন?

জাব্বার সাহেব চিঠি ও ফটো দুটো তার হাতে দিয়ে বললেন, এগুলো দেখ। ডালিয়া চিঠি পড়ে ও ফটো দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, আব্বা কবে রাফিয়াকে আনতে যাচ্ছ।

জাব্বার সাহেব বললেন, আল্লাহপাক রাজী থাকলে দু-এক দিনের মধ্যে যাব ডালিয়া বলল, আমিও তোমাদের সংগে যাব।

জব্বার সাহেব বললেন, ঠিক আছে মা তাই যাবি। ডালিয়া আব্বার হাতে চিঠিটা দিয়ে ফটো দুটো নিয়ে নিজের রুমে ফিরে এসে রাফিয়ার এখনকার ফটো দেখে চিন্তা করল, কায়সার যে মেয়েকে ভালবাসে সে নাকি আমারই মত দেখতে। সে নাকি পাহাড়ী সর্দারের মেয়ে। রাফিয়া আমার জমজ বোন। তাহলে রাফিয়াই কি কায়সারের ভালবাসার পাত্রী? যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে খুব সাবধান হতে হবে।

মুবিন স্কুল থেকে এসে আব্বা-আম্মার কাছে বড় আপার কথা শুনে ডালিয়ার কাছে এসে বলল, আপা, বড় আপার এখনকার ফটোটা দাও তো? তারপর তার হাত থেকে ফটোটা নিয়ে দেখে বলল, ঠিক তোমার মত। একটু পরে হাসতে হাসতে বলল, বড় আপা এলে বেশ মজা হবে কিন্তু।

ঃ এতে মজার কি আছে?

ঃ মজা না? তোমাদের দুজনের চেহারা এক। কে বড় আপা কে ছোট আপা চিনবো

কি করে।

ডালিয়া হেসে উঠে বলল, ফটোতে একই রকম দেখালেও বাস্তবে কিছু না কিছু তফাৎ থাকবেই।

ঃ যদি থাকে তা হলে ভালই। নচেৎ আমি একটা বুদ্ধি করেছি।

ঃ কি বল না শুনি।

ঃ বড় আপাকে সব সময় শাড়ী পরতে বলবো আর তুমি সব সময় সালওয়ার কামিজ পরবে। তাহলে চিন্তে কোন অসুবিধে হবে না।

তোর বুদ্ধিটা একেবারে খারাপ না। তবে আপা যদি সব সময় শাড়ী পরতে রাজী না হয়?

ঃ তাহলে তাকে বলবো, সে যখন সালওয়ার কামিজ পরবে তখন যেন কপালে টিপ পরে।

ডালিয়া আবার হেসে উঠে বলল, মুসলমান মেয়েদের টিপ পরতে নেই বাদ দে ওসব কথা। আপা আগে আসুক তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

পরের দিন জাব্বার সাহেব অফিসে এসে মালিককে ঘটনাটা খুলে বলে সিলেটে যেতে চাইলেন।

শামসুল আলম সাহেব বললেন, নিশ্চয়ই যাবেন। আপনি কি চিঠি ও ফটো দুটো সংগে এনেছেন?

জাব্বার সাহেব জ্বী এনেছি বলে পকেট থেকে চিঠি ও ফটো বের করে দিলেন শামসুল আলম সাহেব প্রথমে চিঠিটা পড়লেন তারপর ফটো দেখে খুব অবাক হয়ে ভাবলেন, এই মেয়ের ফটোইতো কায়সার তার মাকে দিয়ে গেছে। সেটা গোপন করে ঠিকানাটা পড়ে আরো অবাক হয়ে বললেন, আরে ইনি, মানে আপনাকে যিনি এগুলো পঠিয়েছেন, উনাকে গত কাল আমি একটা চিঠি পাঠিয়েছি। আমার ছেলে মানে কায়সার তার মেয়েকে পছন্দ করেছে। কায়সার আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছে। তাই আমিও যাব বলে চিন্তা করে চিঠি দিলাম। ভালোই হলো এক সংগে যাওয়া যাবে।

জাব্বার সাহেবও অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? তাহলে আপনি কবে যাচ্ছেন?

ঃ ভাবছি পরশু রওনা দেব। একসঙ্গে আমাদের মাইক্রোবাসে যাওয়া যাবে কি বলেন?

জাব্বার সাহেব বললেন, তাই হবে স্যার। কিন্তু আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে যেতে চাচ্ছে।

শামসুল আলম সাহেব বললেন, কোন প্রবলেম নেই। আমিও আমার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি সকাল নটার মধ্যে রেডি থাকবেন, আপনাদেরকে তুলে নেব

ঠিক আছে স্যার তাই হবে বলে জাব্বার সাহেব নিজের রুমে ফিরে এলেন। সেদিন বাড়ীতে এসে স্ত্রীকে সাহেবের কথা বললেন।

শুনে আকলিমা বেগম বললেন, আমার কি মনে হয় জান? রাফিয়াকেই কায়সার পছন্দ করেছে।

জাব্বার সাহেব বললেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। আমারও তাই মনে হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে শামসুল আলম সাহেব ও ম্যানেজার জাব্বার সাহেব তাদের ফ্যামিলিসহ রওনা দিলেন।

পরিশিষ্ট

শসামসুল আলম সাহেবের চিঠি পেয়ে এবং জাব্বার সাহেবকে চিঠি দেবার পর দেলওয়ার সর্দার চিন্তা করলেন, এবারে কথাটা আদিলকে জানান দরকার। রাত্রে ছেলেকে ডেকে বললেন, কিছু দিন আগে বলেছিলে, কেন আমি সাবিহাকে এত লেখাপড়া করাচ্ছি। তার কারণ বলছি শোন, সাবিহা তোর আপন বোন নয়। প্রায় ষোল-সতের বছর আগে একদিন তোর মাকে নিয়ে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর উরুশের সময় মাজার জিয়ারত করে বাড়ী ফিরছিলাম। টাউন থেকে কিছুদূর আসার পর রাস্তায় খুব ভীড় থাকায় আমাদের গাড়ী আস্তে আস্তে চলছিল, হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা ভিখারী মেয়ের কোলে চার-পাঁচ বছরের খুবসুরৎ মেয়েকে কাঁদতে দেখে সন্দেহ হয়। তখন আমার মাজার শরীফের মাইকে মেয়ে হারানোর কথা মনে পড়ল। আমি গাড়ী একপাশে থামিয়ে ভিখারী মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে ঠিক মত উত্তর দিতে না পারায় আমার সন্দেহটা দৃঢ় হল। তাকে পুলিশের ভয় দেখাতে উরুশ শরীফ থেকে মেয়েটাকে চুরি করে আনার কথা স্বীকার করল। আমি তখন তাকে পাঁচ শত টাকা দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠি। তারপর তোর মাকে বললাম, একে মাজার শরীফের খাদেমের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি চল। তোর মা মেয়েটাকে আদর করতে চুপ করে গিয়ে ছিল। বলল, আমি একে মেয়ের মতো মানুষ করবো ফেরৎ দিবো না। আমি শুনে খুব রেগে যাই। তখন তোর মা আমার পায়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাদের কোন মেয়ে নেই। মেয়েটাকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। আমি কিছুতেই ফেরৎ দিব না। তোর মায়ের কান্না দেখে আমারও মনটা মেয়েটার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে আমরা ঘরে ফিরলাম। তুই যখন জিজ্ঞেস করলি বাবা এই মেয়েটা কে? তখন

আমি বললাম, তোর ছোট বোন। তোর এক খালার ছেলেমেয়ে হয় নি বলে সে এতদিন মানুষ করেছে। এখন তার ছেলেমেয়ে হয়েছে। তাই ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। ওর নাম ছিল রাফিয়া। বাড়ীতে এনে আমি সাবিহা রাখলাম। পরে কাগজে হারানো বিজ্ঞপ্তিতে সাবিহার ফটো দেখে সেটা কেটে রেখে দিয়েছিলাম।

তারপর থেকে আমার প্রায় মনে হয়েছে সাবিহাকে ফেরৎ না দিয়ে মস্তো বড় গোনাহ'র কাজ করেছি। তখন ভেবেছিলাম, আমাদের একটা মেয়ে হলে যার মেয়ে তাকে ফেরৎ দিয়ে দেবো। অনেক বছর অপেক্ষা করেও যখন আমাদের কোন মেয়ে হলো না তখন ভেবে ঠিক করলাম, সাবিহা বড় হলে তো একদিন না একদিন আমাদের ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে যাবে। তাহলে যার মেয়ে তার কাছে ফেরৎ দিয়ে দেওয়াই ভাল। সে কথা তোর মাকে বলতে কেঁদে কেঁদে বলল, একান্ত তুমি যদি তাকে তার বাবা-মায়ের কাছে ফেরৎ দিতে চাও, তাহলে একদম বিয়ে দেবার বয়স হলে দিও। তার আগে ফেরৎ দিলে জান দিয়ে দেব। তোর মায়ের জন্য এতদিন সাবিহার কথা কাউকে বলি নি। আর ফেরৎও দিই নি। গত কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে একজন ধনী ব্যবসায়ী চিঠি দিয়েছে। তার ছেলের নাম কায়সার। তার ফটোও পাঠিয়েছে। ছেলেটা বাড়ী থেকে রাগ করে এসে যখন কিছুদিন সালুটিকুরে পোস্ট মাস্টারী করছিল, সেই সময় সাবিহাকে দেখে পছন্দ করে বিয়ের ব্যবস্থার জন্য তার বাবাকে জানিয়েছে। তুইও তো তাকে চিনিস। আমি যখন বিমারী হয়ে সিলেট হাসপাতালে ছিলাম, তখন তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সে এখন সিলেট মহিলা কলেজে প্রফেসারী করছে। ছেলেটার বাবা আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি সপরিবারে আসছেন সাবিহাকে বউ করে নিয়ে যাবেন বলে। ছেলেটাকে আমার খুব পছন্দ। তাই আমি তাদেরকে আসার জন্য স্বাগত জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। সেই সংগে সাবিহার বাবা-মাকে সবকিছু জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে একই সময়ে আসার জন্য পত্রের দ্বারা জানিয়েছি। আমার ও তোর মায়ের ইচ্ছা সাবিহার বিয়ের কাজ এখানে সেরে যাদের জিনিস তাদেরকে বুঝিয়ে দেব। বাবার কথা শুনতে শুনতে আদিল যেমন খুব অবাক হল, কায়সারের বিরুদ্ধে যা কিছু করেছে সে কথা ভেবে তেমনি তার খুব অনুশোচনা হতে লাগল। বলল, বাবা, এসব কথা আমাকে অনেক আগে বলা উচিত ছিল। তারপর নিজের রুমে এসে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। ভাবতে লাগল, হাবিব যদি এর মধ্যে কিছু করে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। চিন্তায় তার সারা রাত ঘুম হল না। বিছানায় শুধু এ পাশ ও পাশ করতে লাগল।

শেষে বিছানা তার কাছে অসহ্য হতে বারান্দায় পায়চারী করতে করতে চিন্তা করতে লাগল, কত বড় অন্যায় আমি আগে একবার করেছি, আবার এখন হাবিবকে দিয়ে করাতে যাচ্ছি। বাবা-মা তো সাবিহাকে এনে এক অন্যায় করেছে। আবার আমি কায়সার বাবুকে বার বার বিপদে ফেলে আরো বেশী অন্যায় করছি। খোদা না করুন, হাবিব যদি এর মধ্যে কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে, তাহলে সাবিহার কাছে মুখ দেখাব কি করে? আল্লাহ পাক কি আমাকে মাফ করবেন?

লুবাবার ঘুম ভেঙ্গে যেতে স্বামীকে পাশে না দেখে ভাবল, সে হয়তো বাথরুমে গেছে সেও উঠে বাথরুমে গেল সেখানের কাজ সেরে তাকে না পেয়ে ফিরে আসার সময় বারান্দায় পায়চারী করতে দেখে তার একটা হাত ধরে বলল, তোমার কি হয়েছে, ঘুমোও নি কেন?

ঃ ঘুম এলে তো ঘুমোব।

ঃ তোমার চোখ-মুখ ওরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে আমাকে বল। ব্যবসায় কি কোন ক্ষতি হয়েছে?

ঃ না ওসব কিছু নয়। তারপর সাবিহার ব্যাপারে বাবার কাছে যা শুনেছে সব বলল।

লুবাবা চমকে উঠে বলল, এখন সবকিছু ভুলে গিয়ে হাবিব যাতে কায়সার বাবুর কোন ক্ষতি করতে না পারে তার ব্যবস্থা কর।

আদিল বলল, আগে সকাল হোক তারপর যা করার তা তো করবই। সে রাতে আদিলের চোখে একফোটা ঘুম এল না। খুব ভোরে সাবিহাকে ডেকে তুলে বলল, কায়সার বাবুর সিলেটের ঠিকানাটা দে।

সাবিহার মনে হল, ভাইয়া হয়তো আবার তাদের মেলামেশার কথা জেনে গিয়ে কায়সারকে আরো বেশী শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করবে। এই কথা চিন্তা করে সে মাথা নিচু করে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

আদিল বলল, কি হল রে কিছু বলছিস না কেন? তাকে ভয়ে কাপতে দেখে এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখে সাহস দেবার জন্য বলল, তুই যা ভাবছিস তা নয়। কায়সার বাবুকে ভুল বুঝে যা করেছি, সে জন্যে আমি দুঃখিত। সময় মত একদিন তার কাছে মাফ চেয়ে নেব। এখন সে খুব বড় বিপদে পড়তে পারে। তাকে তা জানিয়ে বাসা ছেড়ে কিছুদিন যেন কোন হোটেল থাকে, সে কথা জানাব বলে ঠিকানা চাচ্ছি।

সাবিহা যেন ভাইয়ার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখ তুলে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, সত্যি বলছ ভাইয়া?

আদিল সাবিহাকে আপন বোন মনে করে কত ভালবেসে এসেছে এখন তাকে শহরের বাবুদের মেয়ে জেনে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তার উপর সে নিজে একবার সাবিহার প্রিয়তমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এখন আবার হাবিবকে দিয়ে তাই করাতে যাচ্ছে। সেই সব ভেবে আদিলেরও চোখ পানিতে ভরে উঠল। ভিজে গলায় বলল। হ্যাঁরে পাগলি সত্যি। একবার ভুল করে যে অন্যায় করেছি। এখন তার বিপদ জেনে যদি কিছু না করি তাহলে আল্লাহর গজব আমার উপর পড়বে।

সাবিহা আদিলকে জড়িয়ে ধরে ভাইয়া বলে ফুঁপিয়ে উঠল। আদিল তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে এনে দে, কাউকে টাউনে তার কাছে পাঠাতে হবে। সাবিহা ভাইয়াকে ছেড়ে দিয়ে ঠিকানা লিখে এনে দেবার সময় বলল, কায়সার আজ বেলা দশটার দিকে ঝর্নার দিকের পাহাড়ে আসবে।

আদিল বলল, এলে ভালই হবে। এখানে যদি কোন বিপদ আসে, তাহলে আমি সামলাতে পারব। আজ তুই যাবি নাকি? সাবিহা বলল, সে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এসে যদি আমাকে না দেখতে পায়, তাহলে মনে খুব কষ্ট পাবে। আর তা নাহলে আমার কিছু হয়েছে ভেবে এখানে চলে আসতে পারে।

আদিল কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভেবে বলল আচ্ছা ঠিক আছে, যাস। দশটার সময় যাবি তাই না?

সাবিহা মাথা নেড়ে সায় দিল। আদিল নামায না পড়লেও সাবিহা নামায পড়ে জানে। বলল, যা তুই এবার নামায পড়ে কায়সার বাবুর সহিসালামতের জন্যে দোওয়া চাইবি। তারপর আদিল নিজের রুমে এসে জামা-কাপড় পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে প্রথমে চিঠি লিখে একটা লোকের হাতে দিয়ে তাকে সিলেটে কায়সারের কাছে পাঠাল। তারপর চিন্তা করতে লাগল, সেদিন হাবিবের এ্যাটিচিউড দেখে মনে হয়েছিল, সে কায়সার বাবুকে খুন করবে। কায়সার বাবু যে আজ ঐ পাহাড়ে আসবে, তা নিশ্চয়ই হাবিবও জানে। এতদিন যখন তার কিছু করার খবর পেলাম না তখন আজ নিশ্চয়ই কিছু করবে। এইসব চিন্তা করে সে জৈন্তাপুর থানায় গেল।

থানার দারোগা সাহেব আদিলকে চেনেন। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে প্রচুর

উপঢোকন পান। তাকে দেখে দারোগা সাহেব সম্মান দেখিয়ে বসতে বলে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

আদিল দারোগা সাহেবকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলল, আমার ম্যানেজার হাবিব, আমার ছোট বোনের সঙ্গে যার বিয়ের কথা হয়েছে তাকে মার্ডার করার প্লান করেছে। কারণ সে আমার বোনকে বিয়ে করতে চায়। খুব সম্ভব আজ সে প্ল্যানটা কাজে পরিণত করবে। সে যাতে তা না করতে পারে সেজন্যে এখন আপনাকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

দারোগা সাহেব আদিলের কাছ থেকে সবকিছু জেনে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে তার সঙ্গে জৈন্তাপুরের ঐ পাহাড়ে রওয়ানা দিলেন।

ঐ দিন হাবিব বাড়ীতে এসে তার জানাশুনা জন ছয়েক গুণ্ডাকে টাকা দিয়ে হাত করে রবিবার দিন সিলেটে এসে একটা হোটেলে উঠল। রাত্রে তাদেরকে কিভাবে কায়সারকে মার্ডার করবে তা বোঝাবার জন্য বলল, কায়সার আটটার সময় এখানে থেকে হুন্ডা করে যাবে তখন তাকে আমি তোমাদের চিনিয়ে দেব। তারপর কায়সার কিছু দূর যাবার পর আমরা ওকে ওভারটেক করে মাইল দশেক গিয়ে একটা নির্জন পাহাড়ী এলাকায় তোমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আমি জীপ নিয়ে জৈন্তাপুর চলে যাব। তোমরা রাস্তার পাশে আত্মগোপন করে থাকবে। কায়সার কছাকাছি এলে তোমরা যা কিছু করার করো। তারপর বাসে করে সিলেট এসে যে যার বাড়ীতে চলে যেও। তবে একেবারে মার্ডার না করে এমন ভাবে আহত করবে, যেন বাছাধন জীবনে আর নরমাল না হতে পারে। হয় অঙ্গহানী করে দেবে অথবা সারাজীবনের জন্য যেন পাগল হয়ে যায়। মার্ডার করলে শালা সি. আই. ডি.-রা কেমন করে যেন সবকিছু বের করে। ফেলে। তবে একান্ত যদি তাকে কাবু করতে না পার তাহলে মার্ডার করতে দ্বিধা করো না। তোমাদের চার জনকে রেখে আমি দুজনকে সংগে নিয়ে জৈন্তাপুর যাব।

পরের দিন প্লান মত হাবিব ওদের মধ্যে চারজনকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে জৈন্তাপুর চলে গেল। বাড়ীতে এসে কায়সারের মতো পোশাক বানিয়ে ছিল। রওনা হওয়ার সময় সেই পোশাক পরে এসেছে। জৈন্তাপুর এসে জীপটাকে একটা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সংগী দুজনকে নিয়ে সেই পাহাড়ের নিচে এল। তারপর তাদেরকে বলল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি পাহাড়ের উপরে যাচ্ছি। কোন বিপদ হলে মুখে আঙ্গুল দিয়ে শীষ দিব। তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। কেউ যদি পাহাড়ে

উঠতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেবে। কিন্তু যদি কোন মেয়েকে এদিকে আসতে দেখ, তাহলে বাধা না দিয়ে গা ঢাকা দেবে। কথা শেষ করে হাবিব দ্রুত পাহাড়ে উঠতে লাগল। উপরে উঠে দেখল, সাবিহা বসে আছে। সে একটু ঘুরে সাবিহার কাছাকাছি এসে একটা গাছে হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ঝর্না দেখার ভান করে অপেক্ষা করতে লাগল। চিন্তা করল সাবিহা তাকে কায়সার ভেবে কাছে এলেই জড়িয়ে ধরে কাজ হাসিল করবে।

এদিকে কায়সার পথে ঐ জায়গায় এসে ব্যারিকেট দেখে থামতে বাধ্য হয়। গাড়ী থামাবার সংগে সংগে চারজন লোক পাহাড়ের আড়াল থেকে এসে তাকে আক্রমণ করল। কায়সার গাড়ী থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল, আর সেই সংগে গাড়ীটাও রাস্তায় কাত হয়ে পড়ে গেল।

কায়সার বিপদের আঁচ পেয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে একজনকে ধরে তলপেটে কয়েকটা ঘুঁসি মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে সে অজ্ঞান হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে রইলো। সেই অবসরে বাকী তিন জন কায়সারকে জড়িয়ে ধরে মারতে লাগলো।

কায়সার কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে একজনের কানের গোড়ায় ক্যারাতের চাপ মেরে অন্য একজনকে ধরে গর্দানে কয়েক ঘা মারতে মুখ থুবরে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারলো না। চতুর্থ জন ততক্ষণে চাকু বের করে কায়সারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটা চাকু চালিয়ে ছিল ঠিক কিন্তু কায়সার দ্রুত পাশ কাটাতে বুকে না গেঁথে উপরের চামড়া হাল্কাভাবে চিরে গেল। তবু রক্ত বেরিয়ে জামা ভিজে যেতে লাগল। কায়সার সেদিকে খেয়াল না করে লোকটার ছুড়ি ধরা হাতটা ধরে পিছনের দিকে এনে চাপ দিতে মটাং করে শব্দ হল। লোকটা আর্ত চিৎকার করে উঠল আর চাকুটা হাত থেকে পড়ে গেল। কায়সার তার দুঁ হাটুর মালাই চাকিতে জুতোশুদ্ধ দু'পা দিয়ে জোরে আঘাত করল। লোকটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। এমন সময় দূর থেকে একটা বাস আসতে দেখে কায়সার তাড়াতাড়ি ওদের চার জনকে রাস্তায় শুইয়ে দিল। তারপর হুণ্ডায় চড়ে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে স্টার্ট দিয়ে তীর বেগে ছুটে চলল, জৈন্তাপুরের ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি এসে হুণ্ডা থেকে নেমে পাহাড়ের দিকে ছুটল। তখন তার মনে হল আমাকে রাস্তায় আটকে সাবিহাকে কেউ বিপদে ফেলতে চায়। ছুটতে ছুটতে সে চারদিকে লক্ষ্য রাখছে, কিছু দূর থেকে দেখতে পেল, পাহাড়ে উঠার রাস্তায় দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে কায়সার ভাবল, এরা ঐ দলেরই লোক। তখন সাবিহার

বিপদের কথা ভেবে তার বুকটা ধক্ করে উঠল। কায়সার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। সে একটু ঘুর পথে লোক দুটোর পিছন দিক থেকে এসে একটা বড় পাথর দিয়ে একজনের মাথায় বেশ জোরে আঘাত করল। লোকটা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে জ্ঞান হারাল। তার অবস্থা দেখে অন্য জন প্রথমে একটু ঘাবরে গিয়েছিল। পরক্ষণে সামলে নিয়ে কায়সারকে আক্রমণ করল। কিন্তু তখন আরও দেরী হয়ে গেছে। কায়সারের ঘুসি ততক্ষণ তার নাকে এসে পড়ল। লোকটা দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে নাক ধরে বসে পড়ল। তখন তার নাক দিয়ে যেমন গল গল করে রক্ত পড়ছে তেমনি চোখ দিয়েও পানি পড়ছে। কায়সার দুহাতে তার কলার ধরে শুন্যে তুলে ছুড়ে দিল। লোকটা আছার খেয়ে পড়ে আর উঠতে পারল না। ঠিক সেই সময় কায়সারের কানে সাবিহার আর্তনাদ ভেসে এল, কে আছো বাঁচাও আল্লাগো তুমি আমাকে এই পশুটার হাত থেকে রক্ষা কর। কায়সার তখন প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পাহাড়ে উঠতে লাগল।

সাবিহা পাহাড়ে উঠে কায়সারকে দেখতে না পেয়ে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, দশটা বেজে দশ মিনিট। তারপর বসে বসে তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে চিন্তা করল, কায়সার তো সাড়ে নটা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে আসে। আজ দেরী হচ্ছে কেন? তাহলে কি তার কোন বিপদ হল? যখন সাড়ে দশটা বেজে গেল অথচ কায়সার এল না তখন তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে উঠে ফিরে আসার জন্য কয়েক পা এগিয়ে এসে কায়সারকে পিছন ফিরে এটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে এসে তার একটা হাত ধরে নিচের দিকে মুখ করে অভিমান ভরা কণ্ঠে বলল, যাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আর তুমি এখানে দাড়িয়ে ঝর্না দেখছ? কায়সারকে কথা না বলে তার হাত দুটো ধরতে সাবিহার গা ছমছম করে উঠল। তার মনে হল, এতো কায়সারের হাত নয়। মুখ তুলে চেয়ে হাবিবকে দেখে রাগে ফুঁসে উঠে ঝাপটা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার দুগালে বেশ জোরে কয়েকটা চড় লাগিয়ে বলল, আপনার এত বড় সাহস, কায়সারের মত পোশাক পরে আমাকে ধোঁকা দিয়ে আমার হাত ধরেছেন।

হাবিব তার হাত দুটো আবার ধরে বুকের উপর টেনে সাঁড়াশীর মতো চেপে ধরে বলল, কায়সার ধরলে দোষ হয় না, আমি ধরলে দোষ। দোষ যখন করেই ফেলেছি তখন আর মনের আশা মিটাতে দোষ কি বলে তার গালে চুমো খেতে গেল।

সাবিহা নিজেকে মুক্ত করার কৌশল জানে। হাবিব চুমো খেতে এলে সে তার গালে এত জোরে কামড়ে ধরলো যে, হাবিব যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল। তখন তার

আলিঙ্গনে ঢিল পড়ল। সেই সুযোগে সাবিহা নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কুংফুর কয়েকটা আঘাত হানলো। হাবিব খুব শক্তিমান যুবক, আঘাত খেয়ে ঘায়েল হলো না। তাড়াতাড়ি কিছুটা দূরে সরে গিয়ে একটা জঙ্গলী গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে ছুটে মারতে এল। সাবিহা দ্রুত পাশ কেটে সরে গেল। হাবিবের হাতে গাছের মোটা ডাল থাকায় সে আঘাত হানতে পারছে না। হাবিব ডাল দিয়ে তাকে বার বার আঘাত করার চেষ্টা করছে। সাবিহা আত্মরক্ষায় কিছুটা সফল হলেও, মাঝে মাঝে ডালের আঘাত পাচ্ছে। এক সময় পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তারপর হাবিবকে ছুটে আসতে দেখে চিৎকার করে যা বলল, তা কায়সারের কানে গেছে। তখন হাবিব ছুটে এসে ডালটা ফেলে দিয়ে একটা চাকু বের করে তার গলার কাছে ধরে সাবিহার উপর উপুড় হয়ে পড়ে বেইজ্জতি করার জন্য তার কাপড় খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, রাজী না হলে জানে শেষ করে দেব। সাবিহা জানের মায়া ত্যাগ করে ইজ্জত বাঁচাবার জন্য নিজের জামা কাপড় ধরে বাধা দিচ্ছে আর আল্লাহ পাকের কাছে চিৎকার করে সাহায্য চাইছে।

ঠিক এই সময় কায়সার সেখানে এসে ঘটনা দেখে ছুটে এসে হাবিবের থুতনিতে খুব জোরে লাথি মারল।

হাবিব সাবিহার কাপড় খোলা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে, সে কায়সারের আগমন টের পেল না। যখন পেল তখন কায়সারের লাথিটা তার থুতনিতে আঘাত করল। হাবিব সাবিহার উপর থেকে ছিটকে দুই তিন হাত দূরে পড়ে গেল।

হাবিব জানে সে কায়সারের সংগে পারবে না। তাই তার লোক দুজনকে ডাকার জন্য মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে শীষ দিল।

হাবিবের লোক দু'জনের একজন ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে। ডাকার সংকেত পেয়ে কষ্টে শিষ্টে পাহাড়ের উপরে আসতে লাগল।

এদিকে কায়সার হাবিবকে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। যখন দেখলো তার নাক, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে আর নিথর হয়ে গেছে, তখন ক্ষ্যান্ত দিয়ে সাবিহার দিকে আসতে লাগল।

কায়সার এসে পড়ায় সাবিহার যেন ধড়ে জান ফিরে এল। আল্লাহ পাক তার ফরিয়াদ কবুল ক র কায়সারকে সময় মত পৌছে দিয়ে ইজ্জৎ বাঁচিয়েছেন সে জন্যে তার দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে সাবিহা এতক্ষণ চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছিল। প্রিয়তমকে তার দিকে আসতে দেখে সে ছুটে আসার সময় দেখতে পেল, একটা লোক

কায়সারকে পিস্তল দিয়ে গুলি করতে যাচ্ছে। কায়সার যখন তাকে জড়িয়ে ধরল সাবিহাও কায়সারকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত লোকটার দিকে ঘুরে গেল। আর তখনই লোকটির পিস্তল থেকে পর পর তিনটে গুলি এসে সাবিহার পিঠে লাগল। সাবিহা আঁ ···· করে উঠে কলেমা তৈয়্যেব পড়ে আরো জোরে কায়সারকে আঁকড়ে ধরে টেনে টেনে বলল, আল্লাহ পাক এ দুনিয়ায় আমাদের মিলন রাখেন নি, তাই এ রকম হল। তারপর তার হাতের আলিঙ্গন শীথিল হয়ে পড়ে যাচ্ছিল।

কায়সার ঘটনার আকস্মিকতায় কয়েক সেকেন্ড বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তারপর সাবিহার কথা শুনে এবং তার আলিঙ্গন আলগা হয়ে পড়ে যেতে দেখে হুঁশ হল। সে আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে দিয়ে লোকটাকে ধরার জন্য ছুটলো।

লোকটা চতুর্থবার গুলি চালাতে খট করে শব্দ হল। কিন্তু গুলি বের হল না। কারণ ঐ পিস্তলে তিনটি গুলি ছিল, সে কথা স্মরণ হতে সে ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু সফল হল না। সামনে দেখল, একজন লোকের সংগে কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে আসছে।

দারোগা সাহেব তাদেরকে হাত তুলে দাঁড়াতে বললো। খুনিটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কায়সার আদিলকে দেখতে পেয়ে ছুটে তার কাছে এসে বলল, আদিল ভাই তাড়াতাড়ি আসুন, সাবিহাকে ঐ লোকটা গুলি করেছে। তারপর সে ছুটে সাবিহার কাছে ফিরে এসে তাকে পাজাকালো করে বলল, শিগ্রী চলুন, একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আদিল ও কায়সারের সংগে ছুটে এসে বোনের অবস্থা দেখে বুঝতে পারল মারা গেছে। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, কাকে আর হাসপাতালে নিয়ে যাবে ভাই? সাবিহা যে নেই। আমরা আসতে একটু দেরী করে ফেলেছি। কথা শেষ করে আদিল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

আর কায়সার চিৎকার করে বলে উঠল না ।

—সমাপ্ত—